بسم الله الرحمن الرحيم

সীরাহ-ই-নববী

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মোরতাজা মোতাহহারী

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

সীরাহ্- ই-নববী

প্রণেতা ঃ
শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মোরতাজা মোতাহহারী

প্রকাশক ঃ
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
বাড়ী নং ৫৪, সড়ক নং ৮/এ
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-৯
ফোনঃ ৯১১৪০০০ ৩২৯৩৭০

প্রকাশকাল ঃ রবিউল আউয়াল ১৪১৪, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
২য় প্রকাশ ঃ রবিউল আউয়াল ১৪১৯, জুলাই ১৯৯৮

মুদ্রণে ঃ
চৌকস
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড। ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪

SIRA-I-NABAWI

Written by :
Shahid Professor Ayatullah Murtada Mutahhari
Published by :
Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran
Dhaka, Bangladesh.
2nd Edition, July 1998

সূচীপত্র

লেখক প্রসংগে	৫
প্রথম অধ্যায় ঃ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ	৭
'ফাহম' ও 'ফিকাহ'-র মধ্যে পার্থক্য	৯
নবী করীম (সঃ)-এর আচার আচরণ	১০
সীরাহ্ শব্দের অর্থ	১২
কবিতা ও কবি	১২
সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব	১৫
দিব্যজ্ঞান দু'ধরনের	১৭
তত্ত্বমূলক ন্যায় শাস্ত্র	২১
কবিতা প্রসঙ্গে	২২
ইসলাম একটি বাস্তব যুক্তিভিত্তিক ধর্ম	২৩
নৈতিকতার আপেক্ষিকতা	২৭
সীমালংঘন	২৯
অত্যাচারীর নিকট প্রার্থনা ও বশ্যতা স্বীকার	৩০
অনুমোদিত ও অনুসরণীয় নীতিসমূহ	৩১
সরলতা ও অকপটতা	৩৩
চেংগিস ও তৈমুর	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উপায়-উপকরণের প্রয়োগ	৪০
কুরআনের বর্ণিত ঘটনাসমূহ সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভরযোগ্য	৪১
ইজতিহাদ	৪২
নবীপুত্র ইব্রাহীম	৪৫
আল্লাহ্র নবী দাউদ (আঃ)	৪৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সত্যের প্রতি আহ্বান ও তার প্রচার	৫৮
সত্যের বাণী কিভাবে প্রচার করতে হয়	৬২
দাওয়াত ও প্রচার একটি কঠিন কাজ ঃ তার জন্যে কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্ত	৬৭
মানুষকে খোদার দিকে আহ্বানের পদ্ধতি	৬৮
নবী সম্প্রদায় এবং সুসংবাদ	৭৫
তানফীর (ভয় প্রদর্শন, পলায়নে বাধ্য করা)	৭৬
ইয়েমেন	৭৭
চতুর্থ অধ্যায় ঃ খোদা ভীতি ও ভয়	৮২
খোদা ভীতি ও সাধারণ ভয়ের মধ্যে পার্থক্য	৮৩
দৃঢ়তা	৮৩
উপদেশ প্রদান (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে স্মরণ করানো)	৮৪
চিন্তার জাগ্রতকরণ ও স্মরণ করানো	৮৪
ইসলামের অগ্রগতির কারণ	৯২
মন্ত্রণা সভা এবং পরামর্শ	৯৫

লেখক প্রসংগে

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের খোরাশান প্রদেশের ফারিমানে ১৯২০ সনে শহীদ প্রফেসর আয়াতুল্লাহ মোরতাজা মোতাহ্হারীর জন্ম। তাঁর পিতা মরহুম শায়েখ মোহাম্মদ হোসাইন মোতাহ্হারী ছিলেন একজন খোদাভীরু ব্যক্তি। খোরাশান হতে শুরু করে সারা ইরান জুড়েই ছিলো তাঁর খ্যাতি।

ফারিমানের ছোট একটি মকতবেই শুরু হয় শহীদ মোতাহ্হারীর শিক্ষার হাতে খড়ি। জ্ঞানের প্রতি প্রচন্ড অনুরাগ ও ধীশক্তি তাঁর মাঝে ধরা পড়ে নিতান্ত বাল্যকালেই। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্যে তাঁর আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তা ছিলো প্রচুর। ১৯৩২ সনে মাত্র বারো বছর বয়সে জ্ঞানের অন্বেষণে ছুটে আসেন পবিত্র মাশহাদ নগরীতে। সতের বছর বয়সে তিনি চলে যান কোম-এ। ইসলামী শিক্ষার প্রতি অসীম ভালোবাসা যে মুহূর্তে তাঁর অন্তরকে প্রজ্বলিত করছিলো ঠিক তখনই সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মোহাক্কিক, সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হুজ্জাত ও আয়াতুল্লাহ্ সদর (তাঁদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর মতো মহান উলেমাদের গভীর সান্নিধ্য হতে তিনি পূর্ণ করছিলেন তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার।

১৯৪০ সনে তিনি তাঁর ভাষায় "হ ফর্ম্র মভণ"-এর নিকট উচ্চতর জ্ঞান অন্বেষণ শুরু করেন। তাঁর কথিত "স্বর্গীয় এ সত্তা"-ই ছিলেন মাত্র দানা বেঁধে উঠা ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা-ইমাম খোমেনী।

১৯৪৪ সন হতে পরবর্তী প্রায় আট বছর একজন ছাত্র হিসেবে শহীদ মোতাহ্হারী আয়াতুল্লাহ্ বুরুযার্দীর সাহচর্য লাভ করেন। সাইয়্যেদ মোহাম্মদ তাবাতাবাই তখন কোম নগরীতে দর্শনের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। ১৯৫০ সনে শহীদ মোতাহ্হারী এ প্রতিভাবান শিক্ষকের ক্লাশে যোগ দেন আবু আলী ইবনে সীনা-র দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে। পরবর্তীকালে শিক্ষকের লেখা পাঁচ খণ্ডের "রেধভডধযফপ্র মত দেধফম্রমযদহ" (উসুলে ফালাসাফাহ) বইটির তিনি একটি স্মরণীয় ব্যাখ্যা লিখেন।

১৯৫২ সনে মোতাহ্হারী তেহ্রানে চলে আসেন। তখন হতে সাধারণ জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে বক্তৃতা দান ও অগণিত বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার মোকাবেলায় ইরানের তরুণ সমাজের জন্যে ইসলামী চিন্তার মশাল প্রজ্বলন ও ইসলামী যুক্তিবিদ্যার পতাকাকে সুউচ্চে উন্নীত করার চেষ্টা করেন।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপনা, মসজিদ ও হোসাইনী ইরশাদে (ধর্ম কেন্দ্র) বক্তৃতার মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যান।

১৯৭৯ সনের ১১ ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিপ্লব সফল হবার আগে এবং পরে ইসলামী বিপ্লবী কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষে এবং জনগণের জন্যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর জিহাদকে অব্যাহত রাখেন।

১৯৭৯ সনের ১ মে বিপ্লবী পরিষদের একটি নৈশ-অধিবেশন হতে ফেরার পথে তিনি ফুরকান নামে একটা ভূয়া-ইসলামী গ্রুপের হাতে শহীদ হন।

শহীদ মোতাহ্‌হারী ৩৫টি অমূল্য গ্রন্থ লিখে গেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম নীচে দেয়া হলো ঃ

১। বস্তুবাদ গ্রহণের কারণসমূহ

২। ইসলামে নারীর অধিকার

৩। হযরত আলী (রাঃ)-এর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

৪। ইসলামের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি পরিচিতি (৭ খণ্ড)

৫। ইসলামী বিজ্ঞান (৩ খণ্ড)

৬। মানুষ ও পরিণতি

৭। মানব জীবনে স্বর্গীয় সাহায্য

৮। শহীদ

৯। যৌন-জীবনের নীতিমালা-ইসলামে ও পাশ্চাত্য জগতে

১০। নাহজুল বালাগাহ ঃ একটি পর্যালোচনা

১১। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ

১২। আল-কুরআন বুঝার পদ্ধতি

উস্তাদ মোতাহ্‌হারী শাহাদত বরণ করলেন। কিন্তু ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যে নিরলস কর্মপ্রবাহ রেখে গেছেন তা তাঁকে যুগ যুগ ধরে চিরঞ্জীব করে রাখবে। সবচেয়ে বড় কথা-ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর স্বপ্ন তা তাঁর জীবদ্দশায়ই সাফল্য অর্জন করে এবং তিনি তা দেখে যেতে সক্ষম হন। তাঁর শহীদী আত্মা চির শান্তিতে থাকুক।

– অনুবাদক

সীরাহ-ই-নববী

প্রথম অধ্যায়

দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ

কুরআন পাক-এ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

(আল কুরআন ৩৩ ঃ ২১)

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অন্যতম সহায়ক উৎস হলো নবী করীম (সঃ)-এর ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের উপর আল্লাহ্র একটা বিশেষ রহমত। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের তুলনায় মুসলমান হিসাবে আমাদের গর্বের বিষয় হলো নবী করীম (সঃ)-এর নির্ভরযোগ্য হাদীসের অধিকাংশই অবিকৃত অবস্থায় আজো আমাদের হাতে রয়েছে। অথচ হযরত মুসা, হযরত ঈসা (তাঁদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক) অথবা অন্য কোন নবীর পক্ষ হতে শোনা গেছে এমন কোন বিশেষ বাণীকে তাঁদের কথিত অনুসারীরা নিশ্চিত করতে পারছে না। অনেক বাণীকে তাঁদের উদ্ধৃতি বলে বলা হয় কিন্তু সেগুলো নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত নয়।

ইসলাম এবং ইসলামের নবীর সাথে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে-মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন চরিত খুবই পরিষ্কার ও তথ্য ভিত্তিক। বস্তুতঃ দুনিয়ার কোন নেতাকেই তাঁর সাথে তুলনা করা যায় ন। নবী পাক (সাঃ)-এর জীবনের নির্ভরযোগ্য দিক, সঠিক ও বিস্তারিত বর্ণনা আজও আমাদের মাঝে সুরক্ষিত। অথচ আর কারো জীবনের এমন বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। মহানবীর জন্মের সন, তারিখ, তাঁর শৈশব ও যৌবনকাল, মরুজীবন, বিদেশ সফর, প্রাক-নবুয়তী পেশা, তাঁর বিবাহের সন তারিখ, বিবাহকালে তাঁর বয়স, সন্তান সংখ্যা ও মৃত্যুকালে তাঁদের বয়স ইত্যাদি সবকিছুই সংরক্ষিত রয়েছে। আজো সঠিক, বিস্তারিত ও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর নবুয়ত

পরবর্তী ঘটনাসমূহ। যেমন-ঈমান গ্রহণকারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি; তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সন, অন্যদের সাথে তাঁর কথোপকথন, তাঁর কৃতিত্ব, কর্মকৌশল, কর্ম-পদ্ধতি ইত্যাদি।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথাই ধরা যাক। তিনি ছিলেন মুহাম্মদের (সাঃ) পূর্ববর্তী নবী। দ্বীন প্রবর্তনকারী নবীদের অন্যতম তিনি। অথচ কুরআনুল করীম যদি নিশ্চিত না করতো তবে অনেকের কাছেই তাঁর নবুয়তের উপর বিশ্বাস রাখা দুরূহ হয়ে যেত। (কুরআনের বিধান মতে দুনিয়ার মুসলমানরা তাঁকে সত্যিকার আল্লাহ্‌র নবী বলেই বিশ্বাস করে।)

খৃস্টানরা নিজেরাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খৃষ্টীয় তারিখগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে না। তারা যদি বলে, খৃষ্টের জন্মের পরে আজ এক হাজার নয় শত এবং কয়েক বছর পার হয়ে গেছে তাহলে তা শুধু গতানুগতিকভাবেই বলে। এ বলা কোন সঠিক তথ্য ভিত্তিক নয়।

আমরা যদি বলি নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পরে এক হাজার কয়েক বছর কেটে গেছে তখন তা হবে একটা নিশ্চিত তারিখ। কারণ এটি সঠিক তথ্য ভিত্তিক। মনে করা হয় খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম তারিখ বলে যে সময়কে দাবী করে তার সম্ভবতঃ দু'শত বছর আগে বা তিন'শ বছর পরে তিনি বাস করতেন। যারা সত্যিকার অর্থে ঈসা (আঃ)-এর উপর বিশ্বাসী তারা ছাড়া অন্য খৃষ্টানরা তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করে। আদৌ দুনিয়াতে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা অথবা তিনি কোন কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব কিনা, এটা তাদের সন্দেহের বিষয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তা মারাত্মক ভুল। কারণ আল কুরআন তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে এবং আমরা মুসলমানরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা এমন ধরনের সন্দেহ থেকে মুক্ত। ঈসা (আঃ)-এর শিষ্য কারা ছিলেন? ঈসা (আঃ)-এর পর বাইবেল গ্রন্থাকারে পরিণত হতে কতদিন সময় লেগেছিল? কতগুলো বাইবেল প্রচলিত ছিল? এসব প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না, সংশয় থেকে যায়। অপরদিকে ইসলামের নবীর ক্ষেত্রে দু'টি বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে-তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও হাদীস। এর কোনটিই সন্দেহযুক্ত নয়। বরং আমাদের জন্য পথ প্রদর্শক ও দলিল হিসাবে কাজ করছে। আমরা তা মেনে চলতে ও তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবাইকে বুঝতে হবে যে, মহামানবদের বাণীগুলো সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ)-এর বেলায় এ কথাটা আরো সত্যি। কারণ তিনি নিজে শুধু কথাই বলেননি, অনুশীলনও

করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ আমাকে এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন যে আমি সামান্য কথার দ্বারা ব্যাপকভাব প্রকাশ করতে পারি।" মূলতঃ সবাই নবী করীম (সাঃ)-এর কথা শুনতেন কিন্তু তাদের সবাই এ কথাগুলোর গভীরতা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারতেন না। সম্ভবতঃ শতকরা পঁচানব্বই হতে নিরানব্বই জনই তাঁর সব কথার অর্থ পূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম ছিলেন না। নবী করীম (সাঃ) এ বাস্তবতাকে আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার কথাগুলো লিখে নাও, সংগ্রহ করে রাখো ও আগামী দিনের বংশধরদের নিকট পৌঁছে দাও। আমার মিম্বরের পার্শ্বে যারা বসে আছে তাদের চেয়ে অনাগত দিনের প্রজন্ম হয়তো আমার কথাগুলোর অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারবে।" রাসূল (সাঃ)-এর এক বিখ্যাত হাদীসে বলা হয়েছে, "আমার কথা যারা শুনেছে, সংরক্ষণ করেছে, আমার কথা যারা ব্যক্তিগতভাবে শুনেনি তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, আল্লাহ্ তাদের সবাইকে সুখী করুন।" তিনি বলেন, "এটা অস্বাভাবিক নয় যে, একজন লোক একটি বাক্যের দ্বারা জ্ঞানের একটি ভাণ্ডার অন্যের কাছে পৌঁছালো। অথচ সে নিজেই হয়তো ঐ কথাটির সঠিক অর্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ।"

'ফাহম' ও 'ফিক্হ্-র মধ্যে পার্থক্য

'ফাহম' হচ্ছে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে জানা; আর অন্যদিকে কোন বিষয়ের উপর গভীর অনুধাবনের নাম 'ফিক্হ্'। 'ফিক্হ্' শব্দটি আমরা গভীর অর্থসম্পন্ন কোন কিছুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। আগেই বলেছি, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন তাঁর কাছ থেকে বিরাট অর্থবহ একটি হাদীস কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি (ফকিহ) এমন লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারে যারা তাদের চেয়েও চিন্তার দিক দিয়ে গভীরতা সম্পন্ন। তাই আমরা দেখছি শতাব্দী পরিক্রমায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের গভীরতা প্রতিনিয়তই আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন, নবী করীম (সাঃ) নৈতিকতা সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু ইসলামী বিজ্ঞান চর্চায় দেখা যায় মাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক পরে নবী করীম (সাঃ)-এর এই মন্তব্য সম্পর্কে লোকেরা বুঝতে পেরেছে। তেমনভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ হাদীসের উপর ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। আইন, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিবিজ্ঞান, ইরফানী জ্ঞানসহ অন্য যেসব বিষয় সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) কথা বলেছেন সে সবের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পরবর্তী যুগের হাদীসবেত্তাগণ নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহ অধিকতর উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছিলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসের অলৌকিক প্রকৃতি এই বাস্তবতার মধ্যে বিদ্যমান।

আমরা যদি আমাদের 'ফিকাহ্'-র দিকে তাকাই এবং শায়েখ সাদুক, শায়েখ মুফিদ ও শায়েখ তুসী যারা হাজার বছর আগে বাস করতেন, তাদের সাথে নয় শত বছর পরের শায়েখ মোরতাজা আনসারীর তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে যে, হাদীসের উপর শেষোক্ত জনের জ্ঞান ছিলো অনেক গভীর এবং তিনি আরো উত্তমরূপে তা বিশ্লেষণ করেছেন। এর কারণ কি এই যে, শায়েখ আনসারী শায়েখ তুসীর চাইতে অধিক বুদ্ধিদীপ্ত ছিলেন? নিশ্চয়ই না। শায়েখ আনসারীর সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত বিস্তারই এর কারণ। সুতরাং নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহ বুঝার জন্য এক হাজার বছর আগের তুলনায় তাঁর নিজের আমলে শায়েখ আনসারী অধিকতর জ্ঞান ও তথ্য সমৃদ্ধ ছিলেন। তেমনিভাবে এক বা দু'শ বছর পরে সম্ভবতঃ এমন ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে যারা শায়েখ আনসারীর তুলনায় নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী আরো গভীরভাবে অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর আচার-আচরণ

নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে যেভাবে অনেক কিছু গুপ্ত অর্থ রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে তাঁর আচরণসমূহও গভীরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (৩৩ ঃ ২১)

আল কুরআন বলছে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর জীবন-চরিত হচ্ছে তাঁর অনুসারীদের জন্য একটা আদর্শ; এর মানে তাঁর সত্তা অন্যদের জন্য দায়িত্ব ও বিধিবিধান আহরণের উৎস বা আলোকবর্তিকা। এটা ঠিক যে, নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনার নিছক বর্ণনা আমাদের জন্য তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সেসব ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণই হচ্ছে আমাদের জন্য বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ অবস্থায় তাঁর বিশেষ ধরনের আচরণ এবং সে আচরণের লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের জানাটা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা (উম্মতগণ) তাঁর হাতে গোনা কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথাও এমনকি আক্ষরিক অর্থেও মনে রাখতে পারি না। আমরা পারছি না তাঁর ব্যবহারিক জীবন ও আচরণের সামান্যতম ব্যাখ্যাও প্রদান করতে। একজন বিশিষ্ট ইরানী লেখক বছর কয়েক আগে ইন্তেকাল করেছেন। যৌবনকালে তিনি তেমন ধার্মিক ছিলেন না। তাঁর জীবনের শেষ ভাগে লেখা কয়েকটা বই আমি পড়েছি। আর এ সুবাদেই তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তিনি "The Wisdom of Religion" বইটির অনুবাদ করবেন বলে একবার

আমাকে জানালেন। বইটি ছিল হযরত মুসা, যরদস্ত, বুদ্ধ ও নবী করীম (সাঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ বাণীগুলোর সমাহার। তিনি বললেন, মূল লেখক নবী করীম (সাঃ)-এর চেয়ে অন্য নবীদের উদ্ধৃতিগুলো বেশী বেশী বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তিনি সেই সাথে পবিত্র কুরআনের একশত আয়াত ও আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ)-এর একশত সংক্ষিপ্ত বাক্য এই বইটিতে সংযোজিত করতে চাইলেন। কুরআনের আয়াত এবং হযরত আলী (আঃ)-এর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করতে তাঁর কোন বেগ পেতে হচ্ছে না বলে তিনি বললেন। সমস্যা হলো নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস নিয়ে। তিনি ভাল আরবী জানতেন না। আবার যেহেতু ফারসী বই পত্রেও তেমন কিছুই তিনি পাচ্ছিলেন না, তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন মহানবী (সাঃ)-এর একশত হাদীস ফারসীতে অনুবাদ করে দেয়ার জন্য যাতে করে তিনি তার নিজের ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তা বর্ণনা করতে পারেন। তিনি কোন ভুল না করে বসেন এ জন্য আমি তাঁর অনুরোধে একশ হাদীস ফারসীতে অনুবাদ করে দেই এবং The Wisdom of Religion নামের বইতে তিনি এগুলো প্রকাশ করেন। ভদ্রলোক একদিন আমাকে বললেন, নবী করীম(সাঃ) যে একথা বলেছেন তা তিনি জানতেনই না। দুনিয়াজোড়া খ্যাতি সম্পন্ন একজন ইরানী লেখক যার পুরো জীবন কেটেছে অফুরন্ত জ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়ে অথচ তিনি জানতেন না আমাদের প্রিয় নবীর হাদীস সম্পর্কে। তাঁর বইটা প্রকাশিত হবার পরই মাত্র তিনি জানলেন এবং স্বীকার করলেন যে, অন্য নবীদের তুলনায় আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর কথাবার্তা ও হাদীসসমূহ গভীর অর্থপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন।

আমাদের এ অবহেলার কারণ কি? আমরা, এমনকি আমাদের বিজ্ঞ লেখকরাও জানেন না যে, নবী করীম (সাঃ) আমাদের জন্য কি বলে গেছেন। নবী করীম (সাঃ)-এর আচরণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমরা সম্ভবতঃ আরো বেশী যত্নহীন। বছর কয়েক আগে এ অনুভূতিই আমাকে বিষয়টিরও উপর একটি বই লিখতে সাহস যুগিয়েছে। প্রথমে আমি কিছু নোট তৈরী করেছিলাম। কিন্তু যতই অগ্রসর হচ্ছিলাম সাগরের অতল গভীরতার মাঝেই যেন আমি আমাকে আবিষ্কার করছিলাম। সত্যিকার অর্থে নবী করীম (সাঃ)-এর জীবন চরিত এতো ব্যাপক ও বহুমুখী এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে এর ক্ষুদ্রতম একটা অংশ হতেই মৌলিক বিধিবিধান তৈরী করা যেতে পারে। এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর যে কোন একটা আচরণই বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করে তুলতে পারে।

সীরাহ্ শব্দের অর্থ

আরবী 'সাইর' ধাতু হতে 'সীরাহ্' শব্দের উৎপত্তি। সাইর অর্থ হচ্ছে হাঁটা; চলাফেরা করা। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলমানরা যথার্থ অর্থেই সীরাহ্ শব্দটি গ্রহণ ও ব্যবহার করেন যদিও আমাদের ঐতিহাসিকরা এ শব্দটির সঠিক অর্থে বাস্তব ব্যবহারে পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। ইবনে ইসহাকই সম্ভবতঃ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সীরাহ্ রচনা করেছেন যা পরবর্তী সময়ে ইবনে হিশাম কর্তৃক সংকলিত হয়। কথিত আছে যে, ইবনে ইসহাক ছিলেন একজন শিয়া এবং তাঁর সময়কাল হচ্ছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে।

আরবীতে 'সিরাহ্' শব্দ ফিলাহ শব্দের সমার্থক। 'ফিলাহ' হলো বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত কাজ। 'জলসাহ' অর্থাৎ 'বসা' ও 'জিলসাহ্' অর্থাৎ 'বসার ধরন' শব্দ দু'টি এমনি ধরনেরই। এখানে পার্থক্যটা সূক্ষ্ম। সাইর হচ্ছে ব্যক্তির আচার ব্যবহার অপরদিকে সীরাহ হলো তার আচার ব্যবহারের ধরন বা পদ্ধতি। বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য হচ্ছে নবী করীম (সাঃ)-এর বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে জানা। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যারা নবী করীম (সাঃ)-এর সীরাহ লিখেছেন মূলতঃ তারা তাঁর আচরণ সম্পর্কেই লিখেছেন। কাজেই তাঁদের এসব গ্রন্থকে 'সীরাহ' না বলে 'সাইর' বলাই অধিক যুক্তিসম্মত। উদাহরণস্বরূপ, 'সীরাহ আল হালবিয়াহ'কে ধরা যাক। এ বইটি বস্তুত 'সাইর'; 'সীরাহ' নয়। কারণ তার মধ্যে নবী জীবনের আচরণাদিই স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশে তাঁর আচার ব্যবহারের ধরন, পদ্ধতি ও ব্যবহার নিয়ে কোন কথা তাতে বলা হয়নি।

কবিতা ও কবি

কবিতার নানান শ্রেণী ও ধরন রয়েছে। কবিতা সম্পর্কে ধারণা রাখেন না এমন একজন ব্যক্তির চোখে রুদাকী, সাদী, মৌলভী রুমী, সানায়ী এবং হাফিজের মতো নামকরা কবির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়বে না। এ ব্যক্তির কাছে সবাই কবি এবং তাদের লেখা সবকিছুই কবিতা। কিন্তু কবিতার রাজ্যে বিচরণ করেছেন এমন একজন ব্যক্তি ভালো করেই জানেন, উল্লেখিত কবিরা সবাই বিশেষ বিশেষ ছন্দ প্রকরণ-যেমন হিন্দী, খোরাসানী-অবলম্বন করে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছেন এবং কারো কবিতায় বীর গাথা, কারোটায়বা সুফীবাদের সুর অনুরণিত হয়েছে। সত্য কথা হলো, কবিতা অধ্যয়নের জন্য চাই কবিতার ছন্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। তা না হলে এ ময়দানে অনভিজ্ঞরা বিভিন্ন কবিতার মাঝে কোন

পার্থক্যই খুঁজে পাবে না। গদ্য সাহিত্যের জন্যও কথাটা প্রযোজ্য। কারণ তারও একটা পদ্ধতি রয়েছে। এসব পদ্ধতির উপর জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিই বিভিন্ন ধরনের গদ্যের মাঝে পার্থক্য খুঁজে পান। সাধারণভাবে বলা যায় শিল্পকর্ম সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা যার নেই তার কাছে যে কোন প্রকার দালান তৈরী, টাইলের কাজ অথবা খোদাই কর্ম ইত্যাদি শিল্প হিসাবে আবির্ভূত হবে। অথচ একজন শিল্পীর নিকট গেলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগেরই বিভিন্ন ধরন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর কারু ও শিল্পের রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। সম্প্রতি একজন জার্মান লেখকের একটি সুন্দর বই ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। "ইসলামী আর্ট" নামে এই বইতে ইসলামী বিশ্বে ও সভ্যতায় ইসলামী শিল্পকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে প্রমাণ করা হয়েছে যে শিল্পকলার দিক থেকে ইসলাম একেবারেই স্বাধীন-স্বতন্ত্র।

সাধারণ মানুষের কাছে এরিস্টটল, আল-বেরুনী দু'জনই পণ্ডিত, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসাবে সমান মর্যাদা সম্পন্ন। ইবনে সিনা, প্লেটো, বেকন, দেকার্তে, স্টুয়ার্ট মিল ও হেগেল এঁদের সবাই পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ। তেমনি একজন সাধারণ মানুষ শায়েখ সাদুক, শায়েখ কুলাইনী, ইখওয়ান আস সাফা (শিয়া উলেমাদের একটি দল) এবং নাসির উদ্দিন তুসীর মত পণ্ডিত বিজ্ঞানীদেরকে একই মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। কিন্তু জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভালো করেই জানেন যে, এসব পণ্ডিত ও দার্শনিকের চিন্তা, কর্মপদ্ধতি ও কাজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। মূলতঃ প্রত্যেক পণ্ডিত ব্যক্তিরই রয়েছে তার নিজস্ব পদ্ধতি। কেউ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন যুক্তি ও অবরোহ প্রণালীর উপর, সবক্ষেত্রে অনুসরণ করেন এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যাকে। এমনিভাবে এসব যুক্তিবিদ্যাকে তিনি চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য ইত্যাদি যে কোন জ্ঞানগত বিষয়ের বিশ্লেষণেই ব্যবহার করে থাকেন। কেউ কেউ আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর বেশী নির্ভর করতে পারেন। আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। বলা হয় আল-বেরুনী ও ইবনে সিনার মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল। অথচ তারা ছিলেন সমসাময়িক কালের দু'জন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে প্রথমজন ছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর ও দ্বিতীয়জন ছিলেন এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

কেউ কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের উপর বেশী গুরুত্ব দেন অথচ সেক্ষেত্রে অন্যরা বিভিন্ন বর্ণনা ও ঐতিহ্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মরহুম আল্লামা মাজলিশি যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর কোন গ্রন্থ রচনা করতে চাইতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্ন বর্ণনা, মতামত ও ঐতিহ্যের উপর নির্ভর

করতেন। যেগুলোর প্রামাণিকতার উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনার জন্য চলে আসা প্রাসঙ্গিক মতামতকেই আগে খুঁজে বের করতেন। আবার বর্তমান যুগের শুভ-অশুভ বিষয়ের উপর কিছু লিখতে গেলে তিনি অবশ্য বর্ণনার উপরই নির্ভর করতেন।

আচরণেরও বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি ও ধরন রয়েছে। তাই সাধারণতঃ আচরণ বিদ্যা হলো কোন ব্যক্তির বিভিন্ন চালচলন ও রীতি নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান। দুনিয়ার রাজ রাজড়াদের নিজস্ব বিশেষ রীতিনীতি ছিল। দার্শনিক ও ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য একই কথা প্রযোজ্য। তেমনিভাবে সমস্ত নবীরও বিশেষ ও সাধারণ রীতিনীতি বিদ্যমান ছিলো। এবং প্রত্যেকেরই আচরণের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য।

কবি, শিল্পী ও দার্শনিকদের অনেকে তাদের কর্মে কোন বিশেষ পদ্ধতি ও ধরন অনুসরণ করেন না। কখনো যুক্তি, কখনো জ্ঞান, কখনো অনুভূতি আবার কখনো বা আবেগের উপর তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাদের মাঝে সঠিক যুক্তিধারার অভাব রয়েছে। তাই তাদের ব্যাপারে আমাদের আলোচনার কিছু নেই। আচরণের ক্ষেত্রে প্রায় কারোই নিজস্ব কোন ধরন ধারণ নেই।

আমাদের অনেকেই জীবন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত। কেউ জানতে চাইলে আমরা তা বলতেও পারি না। খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই জীবনের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে চান এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ একটা পদ্ধতি ও ধরন অনুসরণ করে থাকেন। নবী করীম (সাঃ)-এর 'সীরাহ্' আলোচনা করলেই, তিনি তাঁর মনজিলে পৌছার জন্য যে বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। উদাহরণ হিসাবে, তাঁর নেতৃত্ব দেবার পদ্ধতি (মদীনা হতে মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি যেভাবে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এরপর হতে তিনি যে ইসলামী সমাজের নেতা ছিলেন), জনসাধারণের মধ্যে তাঁর বিচার-আচার, একাধিক স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তাঁর আচরণ, বন্ধু ও সঙ্গীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, দুর্দান্ত শত্রুদের মোকাবিলা এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব

সমাজ পরিচালনার জন্য কেউ কেউ শক্তির উপর নির্ভর করেন। তারা ক্ষমতা ও শক্তির বাইরে কিছুটা চিন্তা করেন না। তাদের দর্শন হচ্ছে "দু'গজ লম্বা একটা লেজের তুলনায় একটা শিং অধিকতর প্রয়োজনীয়।" শক্তি ও চাপের এ পলিসি অনুসরণ করে বর্তমান আমেরিকা বিশ্বাস করছে যে একমাত্র এর মাধ্যমে যে কোন প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। এটা হচ্ছে 'ইয়াজিদী' পলিসি। কেউ কেউ চাতুরী ও প্রতারণাকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করেন। কেউ কেউ নৈতিকতার উপর নির্ভর করতে চায়। তবে সে নৈতিকতা হতে হবে সত্যিকার অর্থেই নৈতিকতা। (এমনটা হবে না যার দ্বারা বরং নৈতিকতাকেই অপমান করা হয়। আন্তরিকতা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতাই ছিলো হযরত আলী (আঃ)-এর রাজনীতির পদ্ধতি। যা অন্যদের ছিলো না। বরং অনেকেই কূট-কৌশলকে সত্যিকার রাজনীতি মনে করেন। আর এ কারণে 'রাজনীতি' শব্দটির সঠিক অর্থ পরিবর্তিত হয়ে আজ কূট-কৌশল ও প্রবঞ্চনাতে রূপ নিয়েছে। অথচ রাজনীতি হচ্ছে গণবিষয়ক ব্যবস্থাপনা। এর বদলে তা এখন সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন রাজনীতিক হলেন একজন প্রশাসক। আর এজন্যেই আমাদের মাসুম ইমামগণকে বলা হতো "আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের রাজনীতিক।" পরামর্শের ব্যাপারটি ধরা যাক। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, আমাদের মহানবী (সাঃ) নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পরও নিজের খেয়ালখুশী মতো কিছুই করেননি। অথচ সাহাবাগণ তাঁর উপর এমনভাবে বিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করার জন্য হুকুম দিলেও তাঁরা নির্দ্বিধায় তা করতেন। তিনি একা একা কোন সিদ্ধান্ত নেয়া পছন্দ করতেন না। বরং যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে সমাধানে পৌছাকেই তিনি অধিক শ্রেয় মনে করতেন। একা একা সিদ্ধান্ত নেয়ার অপকার সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এ অপকারের সর্বনিম্নটা হচ্ছে সাহাবাদের ব্যক্তিত্ব প্রসারণে বাধা প্রদান করা, সাহাবাদেরকে চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান বিবর্জিত বলে ধারণা করা, পরবর্তীকালে যা অবশ্যই খারাপ নজির হিসাবে আবির্ভূত হতো। এভাবে তিনি স্বার্থান্ধ ও স্বৈরাচারী পদ্ধতি হতে দূরে অবস্থান করেছেন। এর পরিবর্তে তিনি বরং সত্যিকার একজন নেতার ন্যায় তাঁর উম্মতের চিন্তার পথ প্রদর্শন করেছেন। বদর ও ওহুদের যুদ্ধের সময় তিনি সাহাবাদের বললেন যে, মুশরিকরা মদীনার কোন একটা স্থান পর্যন্ত এসে গেছে। এমতাবস্থায় করণীয় ছিল নগরীর বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করা অথবা মদীনাতে বসে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করা; যাতে করে শত্রু মদীনাকে অবরোধ করার সুযোগ

না পায়। এর কোন্‌টা শত্রুদেরকে পরাজিত করতে সুবিধা হবে তা তিনি সাহাবাদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন। বয়স্ক ও অভিজ্ঞ অনেকে নগরীর ভেতরে অবস্থানকেই উত্তম মনে করলেন; অপরদিকে যৌবনের উচ্চাকাংখা সমৃদ্ধ যুবসমাজ মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিয়ে বরং দুশমন পরিবেষ্টিত হওয়ার ধারণার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা এটাকে নিতান্তই অপমানজনক মনে করেন। নবী পাক (সঃ) নিজে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সাহাবাগণের সাথে একমত ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল নগরীর ভেতরে অবস্থান করলেই অধিকতর সুবিধা হবে। এরপরও যেহেতু সাহাবাদের অধিকাংশ ছিল যুব শ্রেণীর তাই তিনি তাঁদের প্রস্তাব অর্থাৎ মদীনার ওহুদ পাহাড়ে গিয়ে দুশমনদের মোকাবিলার পথ বেছে নিলেন। অস্ত্র হাতে তিনি সকলকে অগ্রসর হবার হুকুম দিলেন। এমন সময় যুবকগণ তাঁর নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন দ্বিমত থাকলে তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেবে। তাঁরা বললেন, রাসূল (সাঃ) নিজে মদীনার বাইরে যাওয়াকে ক্ষতিকর মনে করেন তবে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর মতামতকেই মেনে নেবেন এবং তাঁদের মতামতের পরেও তাঁরা নগরীতেই অবস্থান করবেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আবার অস্ত্র সংবরণ করা কোন নবীর পক্ষেই শোভা পায় না। তিনি জোর দিয়ে বললেন, বাইরে যাবার যেহেতু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেহেতু তাদেরকে তাই করতে হবে।

এ ঘটনায় বিরাট শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন-"নবী করীম (সঃ) ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকের মতো। তিনি তাঁর ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরী রাখতেন। অন্ধ হৃদয়, বধির কর্ণ অথবা বোবাদের জন্য যখনই প্রয়োজন হতো তিনি তা প্রয়োগ করতেন। তিনি তাঁর ওধুধ সামগ্রী নিয়ে অচেতন ও অবহেলিত মানুষকে অনুসরণ করতেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞতার মশাল হতে অনেকেই হেদায়েত নেয়নি; অথবা আলো জ্বালেনি তাঁর জ্ঞানের পরশ পাথর হতে। তারা যেন চরে বেড়ানো চতুষ্পদের মতো অথবা শক্ত কোন পাথর।"

সকল মানুষই চিন্তা করে। কিন্তু সকলেই যৌক্তিক চিন্তা করে না। বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতেই সকলেই বিশেষ ধরনের আচরণ করে। কিন্তু খুব কম সংখ্যকই নির্দিষ্ট নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয় যার থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হয় না। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যৌক্তিক আচরণ করে না। যৌক্তিক চিন্তা হচ্ছে, যৌক্তিক নীতি ভিত্তিক। সামান্য সংখ্যক মানুষই পারে তা রক্ষা করতে। আর বাকী সকলে তাদের চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ই দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।

দিব্যজ্ঞান দু' ধরনের

দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান দু'প্রকারের। দূরকল্পনামূলক বা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বা বাস্তব। ধর্মতত্ত্ব, অংক শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষবিদ্যা, সঙ্গীত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি হলো তাত্ত্বিক দিব্যজ্ঞান। অপরদিকে নৈতিকতা, রাজনীতি, গার্হস্থ বিজ্ঞানকে বলা হয় ব্যবহারিক ধর্মদর্শন বা দিব্যজ্ঞান। যুক্তিশাস্ত্রে এসব শ্রেণী প্রকরণ করা না হলেও এগুলোর রয়েছে যৌক্তিক মানদণ্ড। সুতরাং আমরা তাত্ত্বিক মানদণ্ডকে সাধারণ যুক্তির মধ্যেই পেতে পারি। এবং ব্যবহারিক মানদণ্ডকে বলা যেতে পারে পদ্ধতি ও আচার ব্যবহার।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত একটা সুনির্দিষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করা, জীবনের সর্বত্রই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। নবী করীম (সাঃ) এমনটিই করেছেন। তিনি বিশেষ যুক্তিকে অনুসরণ করেছেন। মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিৎ তাঁর সেসব বাস্তব যুক্তি ও আচরণগত পদ্ধতি অনুসন্ধান করা ও সে অনুযায়ী আমল করা।

মার্কসবাদে বলিষ্ঠ যুক্তির অভাব রয়েছে। স্থান এবং কালের অবস্থা দিয়ে জীবন এখানে প্রভাবিত। শ্রেণী চরিত্র ও ক্ষমতা কাঠামোর বেলায় এ প্রভাব বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত অবস্থান বিশ্লেষণে মার্কসবাদ কোন ব্যক্তির চিন্তা, মতামত ও বিশ্বাসের মৌলিকত্বকে স্বীকার করে না। মার্কসবাদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে যে সকল মানুষের চিন্তা একমুখী হওয়া অসম্ভব। কারণ দরিদ্র হতে বিত্তবান অথবা বিত্তবান হতে দরিদ্রে এসে পরিবর্তন ঘটলে মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ধরন বদলে যায়। বস্তুতঃপক্ষে একজন বঞ্চিত মানুষ-সারাজীবন যে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং সমস্ত বঞ্চনার স্বাদ গ্রহণ করেছে, ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তার মানসিক গঠন জীবনের বিশেষ অবস্থা হতে সৃষ্ট। সে ন্যায় বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতার দাবী করে এবং সে যা বলে তার প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাস পোষণ করে। কারণ জীবনের বিশেষ অবস্থা তাকে এসবে উদ্বুদ্ধ করে। দারিদ্রের মধ্যে কাটাবার পরেও সচ্ছলতা আসলে ঐ ব্যক্তির ধারণা ও বক্তব্যেও পরিবর্তন আসবে। সে তখন তার পূর্বেকার বিশ্বাসকে অস্বীকার করবে এবং সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান করবে। প্রত্যেক ঘটনায়ই মার্কবাদ মনে করে, পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তি স্বার্থেও পরিবর্তন আসে। এবং যেহেতু মানুষ তার স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারে না সেহেতু তার চিন্তায়ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটবে। কেননা

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের চিন্তা তার স্বার্থকেন্দ্রিক। যখন একজন মানুষ বঞ্চিত হয় তখন তার চিন্তায়ও বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থের প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে যখনই সে বিত্তবানদের দলভুক্ত হয় সংগত কারণেই তখন সে তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে।

অতীতে এসব ধারণাকে সচরাচর আমরা অত্যন্ত হালকাভাবে বিবেচনা করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি এর মধ্য হতেই একটি দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। মাশহাদের ধর্মতত্ত্ব ছাত্রদের মধ্যে তাদের একজন বন্ধু সম্পর্কে একটা কৌতুক প্রচলিত ছিল। সে একবার বলেছিল, "আমি আমার নামাজ ঐ ব্যক্তির পেছনে পড়ি যে আমাকে টাকা দেয়। এতে আমার নামায ঠিক মতই আদায় হবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেমন করে? জবাবে সে বললো, "যে আমাকে টাকা দেয় না সেতো একজন পাপী। সুতরাং তার পেছনে আমার নামায আদায় হবে না। যখনই সে আমাকে কিছু টাকা দেয় তখনই আমার মতের পরিবর্তন ঘটে এবং আমার মনে হয় যে সে একজন ন্যায়পরায়ণ (আদেল) ব্যক্তি।"

আমরা সর্বদাই এ বিষয়টাকে হালকা করে দেখছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এটা এক প্রকার দর্শন রূপ নিয়েছে যা এ ভাবধারা প্রকাশ করে যে, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের ফলশ্রুতিতেই মানুষের চিন্তা ভাবনা তার স্বার্থের চারিদিকে আবর্তিত হয়। কিন্তু তার ভেতর পরিবর্তন ঘটে না যদিও এটা শুধুমাত্র একটা দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও আমাদের উচিৎ বাস্তবে এর সত্যাসত্য সম্পর্কে যাচাই করা। মানুষ সম্পর্কে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত। আমাদের দেখা দরকার যে তাদের বিবেক কি আসলেই ব্যক্তি স্বার্থেরই সে রকম খেলার বস্তু। এ তত্ত্বটা কি পরিপূর্ণভাবে মানববিরোধী নয়।? সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে যে, এ দাবীটা মৌলিকভাবেই ভুল। অবিশ্বাসী লোকেরা নিঃসন্দেহে এ রকম দাবী সমর্থন করবে। কিন্তু আমরা কখনো সমর্থন করতে পারি না যে, সমস্ত মানুষই কেবল তাদের স্বার্থের কথাই ভাবে। কেননা অগণিত মানুষ এমন চিন্তা করে না।

আলী আল ভারদী একজন ইরাকী লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। তিনি আরবীতে কয়েকটি বই লিখেছেন যার মধ্যে কিছু কিছু ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি একজন শিয়া একই সাথে তিনি মার্কসপন্থী বিধায় তার লেখায় মার্কসবাদের ছোঁয়া রয়েছে; যদিও ধর্মীয় চিন্তা থাকার কারণে কখনো কখনো মার্কসবাদের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। অত্যন্ত পক্ষপাতহীনভাবে তিনি ব্যক্ত করেন যে 'সচ্ছলতা অথবা দারিদ্র মানুষের চেতনার ধরন পাল্টায় এবং বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় মানুষের চিন্তায়ও পরিবর্তন আসে'-মার্কসবাদী এই তত্ত্ব হযরত

আলী (আঃ)-র জীবনে অসাড় প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আলী (আঃ)-র জীবন চরিতে আমরা তাঁর আচার ব্যবহার ও চিন্তা ভাবনার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখতে পাই না। একদিন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ শ্রমিক ও গরীব সৈনিক। ভূগর্ভে পরীখা খনন, বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজই ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। অথচ ইসলামের সীমানা যখন সম্প্রসারিত হয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও ধনের প্রাচুর্য আসে তখন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে। যাহোক, এমন অবস্থায়ও তাঁর চিন্তার ধরন পরিবর্তিত হয়নি। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বে যখন ধন সম্পদের প্লাবন শুরু হলো তখন শত সহস্র মুসলমান তাদের সত্যিকার ঈমান হারিয়ে ফেললো। প্রকৃতপক্ষে অনেকের উপরই প্রাচুর্যের দুষ্ট প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাকে কোনক্রমেই সাধারণ নীতি বলা যায় না।

বস্তুতঃ নবী যুগের মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ পার্থিব পদ, খেলাফতের মোহ অথবা ধন সম্পদের স্বপ্নের দ্বারা বিপথগামী হয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখিত তত্ত্ব সাধারণ কোন তত্ত্ব হিসাবে অতীতেও ছিল না এখনও নেই। তা না হলে প্রথম যুগের মুসলমানরা সবাই (খোদা মাফ করুন) একই পথ গ্রহণ করতেন এবং একইভাবে অর্থ ও পদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তেন। এর বিপরীতে তাদের এমন সব মহান ব্যক্তির সাথে আমরা পরিচিত যারা এসব প্লাবনের সামনে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আলী (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা পদ ও প্রচুর অর্থ লাভের পরেও তাঁরা মোটেই পরিবর্তিত হননি। হযরত সালমান ফারাসী (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম। মাদায়েনের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে তিনি তেমনই ছিলেন যেমনটা ছিলেন নবী করীম (সঃ)-এর জীবনকালে। মাদায়েন ছিল প্রাচীন ইরানের রাজধানী। ভিন্ন এলাকার (জাতির) কেউ সেখানকার গভর্নর হয়ে এলে জনগণ রুষ্ট হতে পারে, এই ভেবে তৎকালীন খলিফা একজন ইরানী মুসলমানকে সেখানে গভর্নর হিসাবে পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করলেন। সে অনুযায়ী ইরানী বংশোদ্ভূত হযরত সালমানকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। তিনি ছিলেন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন বিশ্বস্ত ঈমানদার ব্যক্তি। উল্লেখ্য যে পূর্বে সাসানীয় রাজা নওশেরাঁ ও খসরু পারভেজ সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁদের প্রাসাদে ছিলো হাজার হাজার দাসদাসী। অন্য আর এক রাজা ছিল ইয়াজদেগর্দ্দ। তাঁর রাজসভায় ছিলো কয়েক সহস্র গায়ক-গায়িকা এবং হেরেমে ছিল বার হাজারের মত রক্ষিতা। কিন্তু সালমানের শাসনকালে তাঁর আসবাবপত্রের মধ্যে একটা চামড়ার থলে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি মাদায়েন হতে সফরে বের হলে নিজেই তা পিঠে বহন করে নিতে পারতেন। অথচ সে সময়টা ছিলো ইসলামের বিজয়ের যুগ। আর সালমানের তত্ত্বাবধানেও ছিলো অগাধ সম্পদরাজি।

আলী আর ভারদী বলেন, হযরত আলী (আঃ)-এর জীবন মার্কস-র মতবাদকে অসাড় প্রমাণ করেছে। আমার বিশ্বাস হযরত সালমান (রাঃ) ও হযরত আবুযরের (রাঃ) জীবনও ছিলো ঠিক তেমনি। হযরত আবুযর হযরত ওসমানের (রাঃ) শাসনের প্রথমাংশ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। যে মুহূর্তে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করার ক্ষমতা ছাড়া সালমানের আর কোন সম্পদ ছিল না, ঠিক তখন অনেকেই টাকার পাহাড় গড়ে তুলছিল। বন্টিত হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ দীনার, দিরহাম। অনেকেই ক্রয় করেছিল অজস্র মেষপাল, ঘোড়া ও অগণিত দাসদাসী।

আমরা বিশ্বাস করি, মহানবী (সঃ)-এর জীবন চরিত মার্কসের দেয়া তত্ত্বকে আরো আগে ভুল প্রমাণ করেছে। নবুয়ত প্রাপ্তির শুরুতে শেব-ই-আবু তালিব হতে আমৃত্যু তিনি একইভাবে ছিলেন। শেব-ই-আবু তালিবে নবী করীম (সঃ)-এর কতিপয় সাহাবা খাদ্য, পানীয় ও জীবনের অন্যসব প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হয়ে আটক অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের অবস্থা এতই সংকটাপন্ন ছিল যে প্রকাশ্যে মুসলিম হিসাবে ঘোষণা করেননি মক্কার এমন কতিপয় মুসলমানের দেয়া সামান্য খাবারের উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হতো। এঁরা রাতের আঁধারে গোপনে গোপনে বিশেষ করে হযরত আলী (আঃ)-এর সাথে দেখা করতেন। এমনি অবস্থার ভিতর দিয়ে শেব-ই-আবু তালিবে নবী করীম (সাঃ) দিন কাটিয়েছেন। এরপর এল হিজরী দশম সাল যখন হতে দুনিয়ার শাসকরা তাঁর সম্পর্কে ভীষণভাবে ভাবতে শুরু করে দিল। তাঁর উপস্থিতিতে তারা ভীত হয়ে পড়লো। তাঁর প্রভাব শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না বরং তিনি এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা অর্জন করলেন যে তৎকালীন বিশ্বের রাজনীতিকরা আরব হতে ইসলামের দ্রুত প্রসারের ও তাদের পতনের সমূহ সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলো। তারপরও শেব-ই-আবু তালিবে বন্দী জীবনের সাথে নবী করীম (সঃ)-এর জীবনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভিন্নতার সৃষ্টি হয়নি।

একদিন এক মরু বেদুঈন রাসূল পাক (সঃ)-এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা শুনে রাসূল (সঃ)-এর নিকট পৌঁছতেই সে কাঁপতে লাগলো। রসূল (সঃ) দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং এ অবস্থার কারণ জানতেই চাইলেন। অতঃপর তিনি লোকটিকে নিবিড়ভাবে আলিংগন করে বললেন, "ধৈর্য ধারণ কর ও সাহসী হও। ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কোন জালেম শাসক নই। আমি একজন মহিলার সন্তান যিনি তাঁর নিজ হাতে ছাগল দোহন করতেন। আমি তোমার ভাইয়ের মতো, সুতরাং তোমার অশান্ত হৃদয় যা চায় আমাকে বলা।"

এটি এমন এক আচরণ যে, আমরা বলতে পারি প্রচুর ক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব ও অজস্র সম্ভাবনা তাঁকে সামান্যতম প্রভাবিত করতে পারেনি। এসব উদাহরণও নবী করীম (সঃ) এবং হযরত আলীর (আঃ) আধ্যাত্মিক অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দিতে যথেষ্ট নয়। তাঁদের মর্যাদা ছিল এর চেয়ে আরো অনেক উচ্চে। সালমান, আবুযর, আম্মার, ওয়াইস করনী এবং তাঁদের মত অগণিত ব্যক্তিত্ব অথবা ইদানীংকালের শেখ আনসারীর মতো ব্যক্তির জীবনের প্রতি আমাদের তাকানো দরকার। শেখ আনসারী জ্ঞানের সবগুলো শাখার সুউচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। নাজাফের মাদ্রাসায় একজন দরিদ্র জ্ঞান অন্বেষণকারী হিসাবে প্রবেশের সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা যেমন ছিলো ঠিক তেমনটিই ছিলো তাঁর ইন্তেকালের মুহূর্তে। মানুষ তাঁর বাড়ী ও আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে বলতো, তিনিতো, সবচেয়ে গরীব। একজন তাঁকে বললো, "জনাব আপনার খেদমতে আসা যাকাতের বা খুমস্ এর অর্থ স্পর্শ না করে আপনি খুবই উত্তম কাজ করেছেন।" "এমন কি উত্তম?" তিনি জানতে চাইলেন। "এটা কি উত্তম নয়! এর চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এমন কি রয়েছে।" ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করলো। উত্তরে তিনি বললেন, "খুব বেশী বললেও আমার কাজ হচ্ছে কাশানের গাধা চালকের মতো। ইস্পাহান হতে পণ্য সামগ্রী কিনে কাশানে নিয়ে আসার জন্যে তাদেরকে অর্থ প্রদান করা হয়। তুমি কি এদেরকে কখনো জালিয়াতী করতে দেখেছ? অথবা তারা জনগণের সম্পত্তি নিয়ে প্রতারণা করেছে কখনো? তারা বিশ্বস্ত এবং কখনো এমন কাজ করে না। তুমি যা কল্পনা কর এটা তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু নয়।" এভাবে আমরা দেখছি এই মহান ব্যক্তিত্বের ধর্মীয় কর্তৃত্ব নিছক ক্ষমতার গর্ব অথবা অন্যের প্রশংসার দ্বারা নিজের হৃদয়কে কখনো কলুষিত হতে দেননি।

তেমনিভাবে কোন কোন ব্যক্তির জীবন ইতিহাস পাঠ করলে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষ সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তি গ্রহণ করতে পারে। এটা প্রমাণ করাও খুব সহজ। মার্কস যদি ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী অধ্যয়ন করতেন তাহলে তিনি এমন ভ্রান্তিকর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন না অথবা এমন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না।

তত্ত্বমূলক ন্যায়শাস্ত্র

তত্ত্বমূলক ন্যায়শাস্ত্র প্রসঙ্গে আমরা যুক্তি বিচার ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করবো। কোন একটা তত্ত্বকে প্রমাণের জন্য গণিত শাস্ত্রে কখনো কখনো কারণকে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে যুক্তিসঙ্গত তাত্ত্বিক অনুমানকে অবশ্যই বিনা দ্বিধায়

গ্রহণ করতে হবে। যেমন, গণিত শাস্ত্রের একজন ছাত্রকে শিখানো হয় যে একটি ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ ১৮০ ডিগ্রী এবং তা কখনো এক ডিগ্রী পরিমাণ কমবেশী হয় না। অতঃপর এর কারণও বলা হয়েছে। এখন গণিতের কোন শিক্ষক কি এতই স্বাধীন বা কর্তৃত্বের অধিকারী যে তার নিজের ইচ্ছামত বলবেন এক সময় এই পরিমাণ ১৭০ ডিগ্রী অন্য সময়ে তা ১২০ বা ২০০ ডিগ্রী? না, এমন কোন অধিকার তার নেই। এমন একটা কিছু প্রমাণের চেষ্টা করলে আইনস্টাইন পর্যন্ত যে কোন একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের দ্বারা সমালোচিত হতেন। তিনি অবশ্যই যুক্তিতর্কের বিপরীত এ কাজটা করতেন এবং কেউ তা মেনে নিতো না।

কবিতা প্রসংগে

কবিতার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মটা হচ্ছে মোমের মত নমনীয় এবং এভাবে তা মানুষ ও কবির সহজ পরিচালনার মধ্যে। সে তার খেয়াল খুশিমতো তাতে উপমা, কল্পনা, অলংকার প্রয়োগ করতে পারে। কবিতা হলো যুক্তি ও প্রমাণ বহির্ভূত। তাকে যদি বলা হয় কোন কিছুর প্রশংসা করতে, সে তা করবে। আবার ঐ একই জিনিষকে নিন্দা ও সমালোচনার জন্য বলা হলে তাও সে পারবে। যেমন, বিখ্যাত ইরানী মহাকবি ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদের প্রতি একদা ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তার প্রতি প্রশংসার নহর প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "মাহমুদ হচ্ছে দুনিয়া ও মহারাজাদের আশ্রয়।" কিছুদিন পর তিনি সেই মাহমুদের দ্বারাই অপমানিত হয়ে সুলতানের প্রতি লিখেছেন-"বাদশাহ্‌র মা যদি সত্যিই একজন রাজকুমারী হতেন তা হলে নিশ্চয়ই তিনি (বাদশাহ্) আমার জন্য আরো অধিক স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবস্থা করতেন।" এভাবেই কবিতা কবির ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। কবিকে যখন তাঁর সফর সম্পর্কে বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করা হয় তিনি হয়তো লিখতে পারেন-

সফর করা খুব উত্তম
এবং আমি বলি দাঁড়িয়ে থাকা হাস্যকর।
গাছগুলো যদি চলতেই পারতো
খুঁজে পেত না তাদেরকে কোন কুঠার বা করাত।

অন্যদিকে যদি স্থবির অবস্থার উপর তাঁর মতামত চাওয়া হয় তবে তিনি হয়তো লিখতে বসবেন-

পাহাড়তো দাঁড়িয়ে থেকে হয়েছে মহান
বাতাস উড়ে বেড়ায়, নাই তার ওজন।

তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে কবিতার ভিত্তি হলো কল্পনা যা নিজস্বভাবে অর্থহীন। অবশ্য কখনো কখনো তা কার্যকরি হতে পারে। বর্ণিত আছে জনৈক রাজা এক শত্রুকে আটক করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি তা করলেনও। শেষে তাকে ফাঁসী দিলেন এবং তার লাশ ঝুলিয়ে রাখা হলো। সে ব্যক্তির একজন ভক্ত কবি এ ঘটনার উপর একটা শোক গাথা রচনা করা গোপনে জনগণের মধ্যে প্রচার করে দেয়। অবশ্য পরবর্তীকালে জনগণ তার পরিচয় জানতে পারলো। কবিতার একটা চরণ ছিল ঃ

আমার ধর্মের শপথ, সত্য দীপ্তিমান

জীবন ও মৃত্যুতে তিনি পেয়েছেন সুউচ্চ স্থান।

এই কবিতা শুনে রাজা মন্তব্য করলেন, এতো প্রশংসা লাভ করতে তিনি নিজে ফাঁসীতে যেতে প্রস্তুত।

বাস্তব জ্ঞানের বেলায় কেউ কেউ দৃঢ়, আপোষহীন, ন্যায়বাদী ও চূড়ান্ত প্রকৃতি সম্পন্ন। মূলতঃ তাদের গৃহীত মূল নীতিগুলোও খুবই নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট। এগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক এতই দৃঢ় যে এখান থেকে কেউই তাদের সামান্য পরিমাণও বিচ্যুতি ঘটাতে পারে না। কোন প্রকার শক্তি, লোভ-লালসা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শ্রেণীগত অবস্থান কিছুই তাদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। এটা এজন্যই যে দৃঢ় ও মৌলিক নীতিমালাগুলো হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রের তত্ত্বের মতো যা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা মেজাজ নির্ভর নয়। নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (আঃ), ইমাম হোসাইন (আঃ) এমনকি তাঁদের অনুসারী সালমান, আবুযর, মেকদাদ, রুশেখ মোরতাজা আনসারী এবং তাঁদের মতো অন্যরা ছিলেন এ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু, অপরপক্ষে কিছু লোকের জীবনের নীতি হচ্ছে ঐসব কবির মতো যাদের চিন্তা অর্থ ও আকাংখা দ্বারা প্রভাবিত। দৃঢ় ও মৌলিক নীতিমালার অভাবে তারা সহসাই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ইসলাম একটি বাস্তব যুক্তিভিত্তিক ধর্ম

নবুয়তী আচরণ সম্পর্কে আলোচনাকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উপেক্ষা করলে চলবে না যে ইসলাম হচ্ছে বাস্তব যুক্তি ভিত্তিক একটা চিন্তাধারা। মানুষের রয়েছে একটি কাঠামো ও আদিম প্রকৃতি যা তাকে কোন রকম শক্তি ও ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত না করে দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় যুক্তি তত্ত্বের অনুসারী করে তোলে ও আগলে ধরাতে সাহায্য করে। এরই ফলে সে বাস্তব যুক্তির একটা দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। যে অবস্থান হতে কোন শক্তি বা ক্ষমতার

দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না। এ কারণেই হযরত আলী (আঃ) একজন ঈমানদারকে তুলনা করেছেন সুদৃঢ় একটা পর্বতের সাথে। মানব জীবনের ক্ষয় ক্ষতি, বঞ্চনার মতো প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত অথবা কল্যাণময় ও শান্ত পরিবেশ কোনটাই তাকে নড়াতে বা স্থানচ্যুত করতে পারে না।

পবিত্র-কুরআনের ভাষায় ঃ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়, কোন বিপর্যয় ঘটলে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে, এ তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

(২২ ঃ ১১)

আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) সংযম সম্পর্কে নাহজুল বালাগাহ্‌তে খুব খুন্দর একটা বর্ণনা করেছেন।

"কোরআনে সংযম (জুহদ)-কে দু'টি কথার দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছেঃ "এটা এজন্য যে তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও।" (৫৭ ঃ ২৩)

জুহদ আত্মার সাথে সম্পর্কিত। ধার্মিকতার ভান করে কোন রকম আমলের দ্বারা তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সত্যিকার সংযমী সেই ব্যক্তি, সমস্ত দুনিয়া তার থেকে দূরে সরে গেলেও যে ভেঙ্গে পড়বে না। অথবা দুনিয়ার সমস্ত রকম সশ্রদ্ধ সহযোগিতায়ও সে উৎফুল্ল হবে না। মূলতঃ এই উভয় অবস্থায়ই ঐ ব্যক্তি একই রকম থাকে এবং কোথাও তার আধ্যাত্মিক একাগ্রতা ও স্থিরতার ঘাটতি হয় না।

হযরত আলী (আঃ) দেয়া 'জুহদ'-এর সংজ্ঞা মার্কস ও হেগেলের চিন্তারও বাইরে। প্রকৃত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে তারা বরং এর উল্টো বিশ্বাস করেছেন। হযরত আলী (আঃ) বলেছেন, মানুষ এমন এক উন্নত স্তর অর্জন করতে পারে যা শ্রেণী স্বার্থ নিরপেক্ষ। ইসলাম এই বাস্তবতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম ও সত্যিকার মুসলমানের মানসিকতা মানব জাতির জন্য হযরত আলী (আঃ) বর্ণিত সংযমের ভিত্তি রচনা করে।

তাত্ত্বিক যুক্তিবিদ্যার মতো ব্যবহারিক যুক্তিবিদ্যায়ও কিছু পদ্ধতি মৌলিকভাবে বিলোপ করা হয়েছে। যেমন, বৈজ্ঞানিক কোন বিষয়ের উপর কারো এমনকি পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামতের আনুগত্য করাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ব্যবহারিক যুক্তিবিদ্যায়ও এই নীতিকে অনুসরণ করা হয় এবং ইসলামও তা সমর্থন করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (আঃ) ও অন্য ইমামদের (তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক) ব্যবহারিক আচরণ বিস্তারিতভাবে

অধ্যয়ন করলে অথবা তাদের সম্পর্কে শিয়া বা সুন্নী লেখকদের লেখা গ্রন্থগুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসে যে, তাঁরা কখনো কোন দিনের শুভাশুভ নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। নাহজুল বালাগায় বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে হযরত আলী (আঃ) খারেজীদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। আশ-আছ বিন কায়েস তাঁর একজন সাথী ছিলেন। ভীড় ঠেলে এস বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমি একজন জ্যোতিষী। আমি শুভাশুভ মান নির্ণয়ে সক্ষম। আমি এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, আপনি এ মুহূর্তে যাত্রা শুরু করলে আপনি ও আপনাদের বিরাট সংখ্যক সঙ্গী পরাজিত হবেন ও মারা যাবেন। উত্তরে ইমাম আলী (আঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর অর্থহীন ভবিষ্যৎ বাণীর উপর আস্থা স্থাপন করে সে মূলতঃ নবী করীম (সঃ)-এর হাদীসকে অস্বীকার করলো। তিনি তক্ষুণি তাঁর সঙ্গীদেরকে জ্যোতিষীর কথায় কান না দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাঁর উপর ভরসা করে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। পরবর্তীতে আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা গেল, খারেজীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যতো সফলতা অর্জন করেন অন্যান্য যুদ্ধে ততো সফলতা লাভ করতে পারেননি।

জুরারীর ভাই আব্দুল মালিক বিন আয়ুন ছিলেন তাঁর আমলের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ও সুবিখ্যাত হাদীসবেত্তা। তিনি জ্যোতিষ বিদ্যা অধ্যয়ন ও তা চর্চা করতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর জ্যোতিষ জ্ঞান তাঁর জন্যই বরং বিরক্তিকর হয়ে আসছে। কারণ প্রতিদিন গৃহ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে তিনি হয়তো নক্ষত্রের অবস্থানের জন্য থেমে যেতেন এবং সন্দেহ করতেন তার সফর শুভ হবে কি হবে না। অতঃপর তিনি হযরত ইমাম সাদীকের (আঃ) শরণাপন্ন হয়ে বললেন, "হে খোদার রাসূলের সন্তান। আমি (Astrology) জ্যোতিষ বিদ্যা দ্বারা রোগাক্রান্ত। [জ্যোতির্বিদ্যাকে(Astronomy) ইসলাম সমর্থন করে]। জ্যোতিষ বিদ্যার উপর আমার কয়েকটা বই আছে। আমার মনে হয় ঐ বইগুলো না দেখলে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।" ইমাম সাদিক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আসলেই কি তুমি এগুলোর চর্চা করছো।" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ"। ইমাম তাঁকে দ্রুত বাড়ী গিয়ে বইগুলো পুড়ে ফেলে জ্যোতিষবিদ্যা ভুলে যাবার পরামর্শ দিলেন।

মোটকথা "অশুভদিন" সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস ছাড়াও কুরআনের সূরা সিজদাহ (৪১ ঃ ১৬) দ্বারাও তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এসব বর্ণনার উপর ইমামদের অধ্যয়ন প্রমাণ করেছে যে, মানব জীবনের উপর জ্যোতিষবিদ্যার কোন প্রভাব নেই আর থাকলেও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা ও আল্লাহ্‌র রাসূল এবং ইমামদের অনুসরণের মধ্যে তা উপেক্ষা করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ,

একজন সত্যিকার মুসলমান কোন সফরে বের হবার ইরাদা করলে সে আল্লাহ্‌র পথে কিছু দান খয়রাত করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে সফরে বের হতে পারে। অধিকন্তু যারা এ বিষয়ের চর্চা করে তারা নিজেরা কিন্তু নিজেদের বাস্তব যুক্তি ও আচরণের বেলায় জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। খোরাশানে, বিশেষ করে, ফারিমানে (লেখকের নিজের শহর) একটা সুপরিচিত ও সর্বব্যাপী কুসংস্কার চালু আছে। লেখক নিজে তা অন্যান্য শহরেও প্রত্যক্ষ করেছেন। কেউ সফরে বের হয়ে কোন সাইয়্যেদ-এর (হযরত আলীর বংশধর) সামনে পড়াটাকে অশুভ চিহ্ন মনে করে। মনে করে এ সফরে বের হলে সে কখনো ফিরে আসতে পারবে না।

অপরপক্ষে, কোন অপরিচিত জনের সম্মুখীন হলে সফর শুভ হবে এবং সফরে বের হওয়া যাবে বলে মনে করা হয়। আমাদের সম্মানিত প্রফেসর মরহুম মীর্জা আলী আগা সিরাজী এ কুসংস্কারটির উৎস বের করে বলেছেন আব্বাসীয় শাসকদের দ্বারা সা'দাত [হযরত আলীর (আঃ) অধঃস্তন বংশধর) ও তাঁদের আশ্রয় প্রদানকারীর, (এমনকি) সমগ্র পরিবারের উপর অপরাধ, ভীতি প্রদর্শন, চাল প্রয়োগ ও হত্যার কারণ থেকেই তা সৃষ্ট। তাই জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হলো যে বাস্তবে সাইয়্যেদগণ অশুভ লক্ষণ না হলেও রাজনৈতিকভাবে তারা তাই ছিলেন। যে বাড়ীতে কোন সাইয়্যেদ বাস করতেন তা ধ্বংস করে দেয়া হতো। আর সময়ের আবর্তে এ কুসংস্কারটি জনগণের মনের গভীরে একটা স্বাভাবিক অশুভ লক্ষণ হিসাবে শিকড় গেঁড়ে বসলো।

কোমের উদ্দেশ্য যখন আমি (লেখক) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো ফারিমান ত্যাগ করি তখন এই ধরনের একটা পরিস্থিতি আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। আমাকে বিদায় জানাতে আমার মরহুমা মা, বোনরা, পরিবারের মহিলারা ও অন্যান্য বন্ধু হাজির ছিলো। কোমের বাস ধরার জন্য আমি আমার গ্রাম হতে বারো কিলোমিটার দূরে ফারিমান যাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহভরে একটা ঘোড়ায় চড়েছি। আর এ মুহূর্তেই বিপরীত দিক হতে একজন সাইয়্যেদকে আমি আসতে দেখলাম। আমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে লাগলাম। কারণ মহিলারা যদি জানতে পারে তবে তারা আমাকে যেতে দেবে না। সাইয়্যেদ আমার নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি সরাসরি কোমে যাবো না ফারিমান হয়ে আবার গ্রামে চলে আসবো। তিনি বললেন, "জনাব, খোদা চাহেত, আপনি কি আবার ফিরে আসছেন?" আমি বললাম, "জ্বি না, খোদার ইচ্ছায় আমি আসছি না।" যাহোক, মহিলারা আমাদের কোন কথাবার্তাই শুনতে পেলো না। নতুবা তারা আমকে

বিদায়ই দিতো না। কাউকে কিছুই না বলে আমি কোমে চলে গেলাম এবং কিছুদিন পরে কোন রকম অসুবিধা বা সমস্যার মোকাবিলা ছাড়াই ফিরে এলাম। একজন মুসলমানের উচিৎ নয় এসব কুসংস্কারকে গুরুত্ব দেয়া। তার উচিৎ খোদার উপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে নিজের মন মগজ হতে এসব ঘষে মেজে বিদায় করে দেয়া।

নৈতিকতার আপেক্ষিকতা

নৈতিকতার আপেক্ষিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ আজকাল সারা দুনিয়ার সমস্যা। সাধারণ মানুষ ভালো ও মন্দ সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, যা অজস্র ভ্রান্ত শিক্ষার জন্য দায়ী। মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভালো ও মন্দের ক্ষেত্রে সাধারণ একটা মানবিক মূল্যমানকে প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেমন করে একজন ব্যক্তি ভালো আচরণ করতে পারে? আজকাল সমস্যাটা বিরাট এক বিতর্কের বিষয় বিধায় এ পর্যায়ে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, নৈতিকতা ও ভালো মন্দের মানদণ্ড হচ্ছে আপেক্ষিক। অন্যকথায় বলতে গেলে, তারা দাবী করেন যে, মানুষ হওয়াটা একটা আপেক্ষিক বিষয়। এর মানে হচ্ছে স্থান ও কাল ভেদে মানবিক মানদণ্ড পরিবর্তনীয়। এ কথার দ্বারা বলা হচ্ছে যে, একটা কাজকে বিশেষ সময় ও পরিস্থিতিতে নৈতিকতার দিক থেকে উত্তম মনে করা হলেও অন্য এক সময় ভিন্নতর পরিবেশে তা অনৈতিক, এটাকেই তারা নৈতিকতার আপেক্ষিকতা বলে বুঝাতে চেয়েছেন।

একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নৈতিকতার মূলনীতি ও মানবিকতার প্রাথমিক মানদণ্ড আদৌ আপেক্ষিক নয় যেমনটা রয়েছে অপ্রধান নীতিমালা ও মানদণ্ডের ক্ষেত্রে। আমরা ইসলামেও এর বাস্তব সত্যটি দেখতে পাই। রাসূল (সঃ)-এর ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়মনীতিকে তিনি সব রকম পরিস্থিতিতে বাতিল ও অগ্রণযোগ্য বিবেচনা করতেন। ইসলাম স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মৌলিকভাবেই এগুলো নিষিদ্ধ করেছে বিধায় আমাদের ইমামগণও এসব নীতিকে কখনো গ্রহণ করেননি। সুন্নী ভাইদের চাইতে আমরা শিয়াগণ একটা বিশেষ সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছি। নবুয়ত প্রাপ্তির পর হতে রাসূল (সঃ)-এর তেইশটি বছর আমাদের সুন্নী ভাইদের রয়েছে। রাসূলে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর ব্যবহারিক আমলের জন্য এ সময়টা অত্যন্ত শিক্ষামূলক। শিয়াদের ক্ষেত্রে এ সময়ের সাথেও রয়েছে আড়াইশত বছরের 'অভ্রান্ততা' (মাসুমিয়াত-ধর্মীয়

ইমামদের প্রসঙ্গ) যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে আমরা দেখেছি কিভাবে আমাদের ধর্মীয় ইমামগণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এর উপর বিস্তারিত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা প্রাত্যহিক জীবন ও অবস্থার সার্বিক সমাধান ও উপলব্ধি খুঁজে পেতে পারি। এ বাস্তবতাই, অন্যান্য মুসলমান ভাই যারা পূর্বেকার তেইশ বছরের উপরই শুধু নির্ভর করেন ও বিশ্বাস করেন যে নবীজিই হচ্ছেন একমাত্র নিষ্পাপ ব্যক্তিত্ব, যা তাদের থেকে আমাদের পার্থক্য করেছে।

উদাহরণ হিসাবে ইমাম আস্-সাদিকের (আঃ) কথা ধরা যাক। তিনি আব্বাসীয়দের শাসনকালে বাস করতেন যে যুগের সাদৃশ্য রাসূল পাক (সঃ)-এর জীবনে ছিল না। এভাবেই আমরা অন্য মুসলমান ভাইদের তুলনায় অনেক ভাগ্যবান। কারণ, বিশেষ পরিস্থিতিতে নবী করীম (সঃ) ও ইমামদের দ্বারা কোন নীতির সর্বসম্মত পরিহার আমাদেরকে এ উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায় যে, এগুলো নৈতিকতার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার নিয়ম নয়। 'নৈতিকতার আপেক্ষিকতা'-এর কোন কোন প্রবক্তা উল্লেখ করতে পারেন যে পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতি ও মানদণ্ড হিসাবে কোন ব্যক্তি ধোঁকাবাজীকে প্রয়োগ করতে পারে। দুনিয়ার অধিকাংশ রাজনীতিবিদ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে এ হাতিয়ার ব্যবহারও করে থাকেন। কেউ তাদের সমগ্র কর্মকৌশল এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠা করে। অন্যরা সময় বিশেষে তা কাজে লাগায়। তারা বিশ্বাস করে রাজনীতিতে নৈতিকতা একেবারেই অর্থহীন। সুতরাং তাকে গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। একজন রাজনীতিবিদ কিছু করা না করার ব্যাপারে শপথ নিতে পারেন, হলফ করতে পারেন অথবা পারেন কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বা অন্য কিছু। কিন্তু এত কিছুর প্রতি ততোক্ষণই আনুগত্য প্রদর্শন করেন যতোক্ষণ এসব হতে তিনি লাভবান হবেন। কিন্তু যখনই এগুলো তার স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় ঠিক তখনই তিনি তার শপথের প্রতি সম্ভবতঃ সম্মান দেখাবেন না। উইলিয়াম চার্চিল তার 'কদণ ওণডমভঢ ঘমরফঢ ঘটর' বইতে মিত্রবাহিনী কর্তৃক ইরানের উপর আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইরানের সাথে তাদের চুক্তি ছিল যে, তারা ইরানের উপর আক্রমণ করবে না। তারপরও তিনি বললেন যে এসব চুক্তি স্বল্পপরিসরে উদাহরণ স্বরূপ কেবল দু'জন মানুষের দ্বারাই মেনে চলা সম্ভব। কিন্তু রাজনীতিতে যখন কোন জাতির লাভ ও মর্যাদা এর সাথে জড়িয়ে যায় তখন এসব চুক্তি তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কোন একটা দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তির খেলাপ করাটা নীতিবর্জিত ও মানবতা বিরোধী শুধুমাত্র এ ধারণার বশবর্তী হয়ে গ্রেট বৃটেনের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আমীর মুয়াবিয়াও তার ক্ষমতার জন্য কর্মকৌশল হিসাবে প্রতারণাকে বেছে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে এসব কর্মনীতি এমনকি খেলাফতের সংকটকালেও প্রত্যাখ্যান করার কারণেই আলী (আঃ) দুনিয়ার আর সব রাজনীতিবিদ হতে আলাদা হয়েছেন। হযরত আলী (আঃ) ছিলেন সত্য ও ন্যায়-নীতির ধারক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানবিক নীতিমালা, সত্যবাদিতা, সততা ও আনুগত্যের উপর খেলাফতের দর্শন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং খেলাফতের দাবীতে তিনি কিভাবে এগুলো পরিত্যাগ করবেন? বস্তুতঃ তিনি নিজে এ দর্শনের শুধু অনুসরণই করেননি বরং মিশরে তার গভর্নর মালিক আশতারকে লেখা একটা সুবিস্তৃত পত্রে এ কথা স্পষ্টভাবে জানান যেঃ

"তুমি যদি তোমার কোন শত্রুর সাথেও কোন চুক্তি সম্পাদন বা কোন বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও তাহলে অবশ্য অবশ্যই তুমি তোমার চুক্তি মেনে চলো এবং বিশ্বস্ততার সাথে তোমার শপথের দায়িত্ব পালন করো। মুসলমান ছাড়াও এমনকি অবিশ্বাসীরাও চুক্তি মেনে চলেছে কারণ চুক্তি লংঘনের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল। সুতরাং চুক্তির ব্যাপারে তোমার শত্রুদেরকেও হতাশ করো না। আল্লাহ নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে চুক্তি ও অঙ্গীকারকে নিশ্চিত অনুমোদন করেছেন।"

নৈতিকতার পরম আপেক্ষিকতার প্রবক্তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন তারা কি বিশ্বাস করেন যে একজন নেতা এমনকি বিশ্বাসঘাতকতাকেও তার নীতি হিসাবে অনুসরণ করবে? স্থান ও কালের পরিবর্তনে তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতক আবার কখনো বা সাধু হবেন? না তা হতেই পারে না। এ নীতি হচ্ছে সর্বৈব ভুল।

সীমালংঘন

এর অর্থ হচ্ছে, কারো উচিত নয় তার জন্য নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়া এমনকি তা যদি শত্রুর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। কাফেরদের মোকাবিলার সময়ও কি সীমা রক্ষা করতে হবে? হ্যাঁ। কুরআনের ভাষায় ঃ

> "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন কর না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (২ ঃ ১৯০)

নবী করীম (সঃ) এবং আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) তাদের সঙ্গীদেরকে সর্বদা উপদেশ দিতেন শত্রুদের মধ্যে আহত, নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, বৃদ্ধ ও যাদের অংগহানী হয়েছে তাদের কোন ক্ষতি না করার। তাদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত না করার। কুরাইশ কাফেরদের কথা ধরা যাক। তারা শুধু আক্ষরিক অর্থেই নবী করীম (সঃ)-র শত্রু ছিল না। বরং তারা সুর্দীঘ কুড়ি বছর যাবত তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে। তাঁর আপনজনদেরকে হত্যা করেছে, হিজরতের পূর্বে মক্কী জীবনে তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের উপর অন্যায় অত্যাচার চালিয়েছে। তার দন্ত মোবারক ও কপাল ভেঙ্গে দিয়েছে। নবী করীম (সঃ) মক্কা বিজয়ের পরে এদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তাদের বেলায়ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। যদিও শত্রুদের উপর সামগ্রিক কর্তৃত্ব তখন ছিল মুসলমানদের হাতের মুঠোয়। মুসলমানগণ কুরআনের সূরা আল-মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করে। (সূরাটি মক্কা বিজয়ের পর নাজিলকৃত সর্বশেষ সূরা)।

> "হে মুমীনগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে; তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখে।" (৫ ঃ ৮)

কোন বিশেষ অবস্থায় সীমা অতিক্রম করা আইন সঙ্গত হবে কি? কখনও না। প্রত্যেকটি জিনিসই নির্দিষ্ট একটা সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ। যা অতিক্রম করা উচিত নয়। মানুষ কেন তার দুশমনের সাথে লড়াই করে? সে যদি তার উপর চাপিয়ে দেয়া কোন জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য লড়াই করে তাহলে তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। মানব জীবনের একটা বাধাকে দূর করার জন্য সে যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে যখনই তার লক্ষ্য অর্জিত হবে ঠিক তখনই তাকে তা বন্ধ করে দিতে হবে যাতে সে নিজে সীমা লংঘন না করে বসে।

অত্যাচারীর নিকট প্রার্থনা ও বশ্যতা স্বীকার

অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার সামনে প্রার্থনা, বিনয় ও বশ্যতার মাধ্যমে শত্রুর সহানুভূতির সন্ধান করা এমন একটা ভুল পদ্ধতি যা আল্লাহার রাসূল (সঃ) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁদের জীবনে কখনো অবলম্বন করেননি। বর্ণিত ভুল পদ্ধতিগুলোর সাথে এটাও নবী করীম (সঃ) এবং ইমামগণ (আঃ) সর্বদা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অনুমোদিত ও অনুসরণীয় নীতিসমূহ

কিছু কিছু নীতি রয়েছে যা নবী করীম (সঃ) ও ইমামগণ সর্বদা আঁকড়ে ধরেছিলেন; এমনকি আপেক্ষিকভাবে হলেও। এই আপেক্ষিকতার পরিমাণ সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

ইসলামে দু'টি নীতি বিদ্যমান। ক্ষমতা অর্জন ও ক্ষমতার ব্যবহার। প্রথম নীতিটা হচ্ছে শত্রুর মোকাবিলা ও আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য মুসলমানদেরকে অবশ্যই শক্তি অর্জন করতে হবে। তবে তারা বিনা কারণে আক্রমণ করবে না। কুরআন এ সম্পর্কে বলেছে ঃ

"তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে; এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে।"

(৮ ঃ ৬০)

'সন্ত্রস্ত করবে' বলতে বুঝানো হয়েছে যে এতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা যাতে করে মুসলমানদের অধিকার ও সীমান্তে হামলা করার মতো সাহস শত্রুরা না পায়। এটা কোন আপেক্ষিক নীতি নয় বরং স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি। শত্রুর অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই মূলনীতি মনমস্তিষ্কে ধারণ করতে এবং তা মেনে চলতে হবে।

অন্য নীতিটি অর্থাৎ 'শক্তি প্রয়োগের' সাথে আগেরটার পার্থক্য রয়েছে। শত্রুকে হটাবার মতো ভিন্ন কোন উপায় যখন থাকতো না তখন রাসূল (সঃ) নিজেও একই কারণে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শক্তি ও ক্ষমতায় ব্যবহার করতেন।

নাহজুল বালাগাতে আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) রাসূল (সঃ)-র আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন-

> "নবী করীম (সঃ) ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকের মতো। তিনি তাঁর ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী তৈরী রাখতেন। অন্ধ হৃদয়, বধির কর্ণ ও বোবাদের জন্য যখনই প্রয়োজন হতো তখনই তিনি তা প্রয়োগ করতেন। তিনি তাঁর ঔষধ সামগ্রী নিয়ে অবহেলিত ও অচেতন মানুষকে অনুসরণ করতেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞতার রৌশনী হতে অনেকেই ফুলকি সংগ্রহ করেনি অথবা কেউ আলো জ্বালেনি তাঁর জ্ঞানের পরশ পাথর হতে। তারা যেন চড়ে বেড়ানো চতুষ্পদ অথবা শক্ত কোন পাথর।"

নাহজুল বালাগায় আবারও বলা হয়েছেঃ-"যারা কোন পাপ করে না বা পাপ হতে যাদেরকে নাজাত দেয়া হয়েছে তাদের উচিৎ পাপী ও অপরাধীদের প্রতি করুণা করা। খোদার কৃতজ্ঞতা আদায়ই হওয়া উচিৎ তাদের নিত্য সহচর। এতে

অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো থেকে তারা বিরত থাকে। ঐসব পরচর্চাকারীর খবর কি যারা তার ভাইদের দোষারোপ করে অথবা তাদের দোষগুলো খুঁজে বেড়ায়?[১]

বস্তুতঃ একজন অসুস্থ লোকের কাম্য হচ্ছে সহানুভূতি। তার উপর দোষারোপ করা বা তাকে একাকী ঠেলে দেয়া ঠিক নয়। বরং তাকে সুস্থ করে তোলা প্রয়োজন। নবী করীম (সঃ) তেমনি একজন চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেছেন যিনি রোগীদের সুস্থ করতেন। চিকিৎসক দু'ধরনের। কারো নিজস্ব নির্দিষ্ট ও স্থায়ী ক্লিনিক রয়েছে। তিনি শুধু ঐসব রোগীরই চিকিৎসা করেন যারা তার কাছে আসে। বাকীদের জন্য তার কোন মাথা ব্যথা নেই। অন্য চিকিৎসকরা আগত রোগীদের রোগমুক্ত করেই সন্তুষ্ট নয়। বরং তাদের গণ্ডির মধ্যে অবস্থানরত সকল রোগীর কাছেই তারা যান। আলী (আঃ)-এর মতে নবী করীম (সঃ) ছিলেন দ্বিতীয় তালিকার চিকিৎসক। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রোগীদের তিনি জীবনভর চিকিৎসা করেছেন। এজন্যই তিনি তায়েফ গিয়েছেন। তিনি মক্কার মসজিদুল হারামে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন; এর দ্বারা লোকদেরকে দ্বীনের পথে ডাকতেন। নিষিদ্ধ মাসগুলোতে আরবের লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারতো না। এ সময়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মক্কায় জড়ো হতো হজ্জ উপলক্ষে। বিশেষ করে তারা যখন আরাফাতের (মক্কা হতে ১২ মাইল দূরে) ময়দানে একত্রিত হতো, নবী করীম (সঃ) এই সময়টা নিরাপদ মনে করে লোকদেরকে হেদায়েতের জন্য সুযোগ হিসাবে নিতেন। হযরতের চাচা আবু লাহাব প্রায়ই লোকদের ডেকে বলতো তার এই "পাগল, মিথ্যাবাদী" ভাতিজার কথায় কান না দেবার জন্য। তদুপরি নবী করীম (সঃ) এসব ভিত্তিহীন অভিযোগের উর্ধ্বে তাঁর দায়িত্বকে তুলে ধরেছিলেন। বর্ণিত আছে হযরত ঈসা (আঃ) কে একদিন একটা পতিতার বাড়ী হতে ফিরতে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গীগণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে খোদার রুহ্ ! আপনি এমন একটা স্থানে কি করছিলেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "চিকিৎসক রোগীদের কাছে যাবেই।"

এসব চিকিৎসক সর্বদা তাদের সাথে (আধ্যাত্মিক) রোগের প্রতিষেধক কাঁচি-ছুরি উভয় জিনিস রাখতেন। সম্ভাব্য ও কার্যকর অবস্থাতে তারা প্রথমটা ব্যবহার করতেন। নতুবা নির্দ্বিধায় তারা দ্বিতীয়টা অর্থাৎ অস্ত্রোপচার ও শৈল্য চিকিৎসা প্রয়োগ করতেন। মূলতঃ কখনও কখনও তারা দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন আবার কখনো বা প্রয়োগ করতেন শক্তি ও ভয়ভীতি।

১। নাহজুল বালাগা, পৃঃ ৩২২

মোটকথা, ইসলামী উম্মাহকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হতে হবে যাতে করে শত্রু মুসলমানদের স্বার্থ, সম্পদ, সীমান্ত ও সংস্কৃতির মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস না পায়। এটা হলো একটা স্থায়ী নীতি। অন্যদিকে ক্ষমতার প্রয়োগ হচ্ছে একটা আপেক্ষিক নীতি। যা কখনো প্রয়োগ হতে পারে আবার কখনো নাও হতে পারে।

. সরলতা ও অকপটতা

নবী জীবনের আপেক্ষিক নীতির মধ্যে সরলতা অন্যতম। ইমাম হাসান মোজতবা(আঃ) তার মামা হিন্দ ইবনে আবি খালিদ হতে বর্ণনা করেন-জীবনের সর্বত্র রাসূল (সঃ) সরলতা ও অকপটতার নীতি বেছে নিয়েছিলেন। খাদ্য, পোশাক, সঙ্গী ও অন্য সব ক্ষেত্রেই তিনি এই নীতির প্রয়োগ করেছিলেন। ক্ষমতাসীন লোকেরা সাধারণতঃ অন্যের প্রতি ভয় প্রদর্শন করে থাকে ও তা কখনো কখনো সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি সে নীতি অবলম্বন করেননি। এমন সীমা লংঘনের উদাহরণ হলো মোহাম্মদ খান কাজার। কেরমানের শাসক থাকাকালীন সময়ে সে ভয়াবহ ধ্বংসের নজীর স্থাপন করেছে। বহু লোককে অন্ধ করে মাটির গর্তে নিক্ষেপ ও হাজারো রকমের সীমা লংঘনকারী অপরাধে ডুবেছিল সে। বর্ণিত আছে একদিন একজন সৈনিক এসে বললো জনৈক সৈন্য তাকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। মোহাম্মদ খান বিষয়টা তদন্ত করলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাকে বলা হলো যে একটি মেয়েকে বিবাহ করা নিয়ে সৈন্য দু'জনের মধ্যে শত্রুতা ছিলো। দ্বিতীয় সৈনিক বিবাহ করতে সফল হওয়ায় প্রথমজন এমন একটি মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা এর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। সে তার ভাতিজা ফতে আলী শাহ্‌কে (সে ছিল যুবরাজ; কারণ মোহাম্মদ খান ছিলো খোজা সুতরাং তার কোন সন্তান ছিলো না) ডেকে বিষয়টার ফয়সালা সম্পর্কে জানতে চাইলো। মিথ্যাবাদী সৈনিকের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত বলে ফতে আলী শাহ বললো। মোহাম্মদ খান বললো, যুক্তির দিক দিয়ে ফতে আলী শাহ নির্ভুল হলেও রাজনীতির বিচারে তার যুক্তি ভুল। কারণ, ন্যায় বিচারের স্বার্থে মিথ্যাবাদী সৈনিকের বিচার হওয়া দরকার কিন্তু আমার হত্যার বিষয়টা অভিযোগকারী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, সাক্ষী ও অন্যান্য জড়িতদের মনমগজে রাতদিন চিন্তার খোরাক হবে। এ লোকগুলো এমনি চিন্তার মধ্য দিয়ে কোন একদিন সত্যি সত্যিই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। সুতরাং এদের কাউকেই জীবিত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। অবচেতন মনে তাকে হত্যার চিন্তা করার দোষে এমনিভাবে মোহাম্মদ খান ঘটনার সাথে জড়িত সকলকে হত্যা করে।

চেংগিস ও তৈমুর ?

তাদের কাজ ছিলো নিজেদের জাঁকজমক ও শানশওকত দ্বারা সাধারণ মানুষকে ভীত করে তোলা ও এর দ্বারা আনুগত্য আদায় করা। নাহজুল বালাগাতে হযরত আলী (আঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে এমন পার্থিব জাঁকজমক ও গৌরব (Glories) দ্বারা সজ্জিত করেন না এবং তাঁরা নিজেরাও তা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন হযরত মুসা (আঃ) তাঁর ভাইকে নিয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বর সাজে ফেরাউনের দরবারে গিয়ে খুবই শান্তভাবে খোদার আনুগত্যের প্রতি তাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, 'ইমরানের পুত্র মুসা (আঃ) তাঁর ভাই হারুনসহ পশমী কাপড় পরে ও হাতে লাঠি নিয়ে ফেরাউনের দরবারে হাজির হলেন। তিনি তাকে মুসলমান হওয়ার শর্তে তার রাজত্ব ও সম্মানের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দিলেন। সে বললো, 'এই লোক দু'টোর কাজ দেখে তোমরা অবাক হচ্ছো না? তাদের দীনতা ও নীচুতা দেখ। অথচ তারাই আমাকে রাজত্ব ও সম্মানের স্থায়িত্ব সম্পর্কে গ্যারান্টি দিচ্ছে। এতই যদি ক্ষমতা থাকতো, তো তাদের স্বর্ণের বাজুবন্ধন কোথায়?' সে নিজের সংগৃহীত স্বর্ণ ও সমুদয় সম্পদের দিকে তাকিয়ে খুব গৌরব বোধ করছিলো এবং পশম ও পশমী কাপড়কে মূল্যহীন ধরে সে এ কথাগুলো বলছিলো।

"মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীদের প্রেরণ করেছেন। তিনি যদি চাইতেন তাহলে তাঁদের জন্য সম্পদের ভাণ্ডার ও স্বর্ণের খনি উন্মোচন করতে পারতেন। তাঁদের চারদিক তিনি বাগিচায় ভরে দিতে এবং আকাশ জুড়ে পাখী ও জমিনের উপর হাজারো রকম জন্তুর সমাবেশ করতেন। তিনি যদি তাই করতেন তাহলে তো পরকালের ব্যাপারে কোন বিচার, পুরস্কার ও সুসংবাদের প্রশ্নই আসতো না। যারা তাঁর বাণীকে কবুল করতো তাদেরকে হিসাব নিকাশের পর উত্তম পুরস্কার দেবার অথবা উত্তম আমলের জন্য ঈমানদারগণ কোন পুরস্কারের দাবী করতে পারতো না। বরং এই কথাগুলোই নিরর্থক মনে হতো, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে দৃঢ় ও প্রত্যয়ী বানিয়েছেন। সাধারণ চোখ তাঁদের অবয়বকে দুর্বলই দেখে। কিন্তু নবীগণ পরিতৃপ্ত অন্তঃকরণ ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টির অধিকারী। কোন কিছুই তাদেরকে দুর্বল করতে পারে না।

"যদি নবীগণ এমন ক্ষমতার অধিকারী হতেন যার ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের উপর কোন আঘাত করা যেত না অথবা মানুষের ঘাড় ধরে যদি তারা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা নিতেন তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ হতো। অহংকার বশতঃ ফিরে যাওয়া হতো অত্যন্ত কঠিন। তখন

তারা নবীদের ভয়ে অথবা তাদের প্রতি আকর্ষণের কারণেই ঈমান কবুল করতো। তাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও কাজ হতো ভিন্ন রকম। আর এ জন্যই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা যে মানুষ নবীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকেই অনুসরণ করবে, খোদার সম্মুখে তারা বিনয়াবনত হবে, তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে এবং শর্তহীনভাবে বিনা দ্বিধায় আন্তরিকতার সাথে তারা তাঁর আনুগত্য করবে। আর যেহেতু হিসাব নিকাশ ও বিচার খুবই কঠিন হবে সেহেতু আখেরাতের পুরস্কার ও সাজা হবে খুবই দীর্ঘস্থায়ী।"[২]

ফেরাউন এ কথা ভাবতেও পারেনি যে দীনহীন বস্ত্র পরিহিত ও হাতে শুকনো লাঠি নিয়ে কিভাবে মুসা ও হারুন তাকে খোদার আনুগত্যের দিকে ডাক দিচ্ছে। কিভাবে তাকে বিনয়াবনত বানাতে এবং তার পরাক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাচ্ছে। ফেরাউন ভাবলো বিজয় নিশ্চিত হয়েই যেন তারা তার সামনে শর্তারোপ করছে। অথচ যদি উজ্জ্বল কোন ভবিষ্যৎই থাকতো তাহলে তাদের চেহারা কি আরো সুন্দর হতো না? স্বর্ণ, অলংকার ও জাঁকজমক থাকতো না?

ফেরাউনের কাছে অর্থ কড়ি ছিলো মহান হবার একটা উপাদান। অন্যদিকে ছেঁড়া মলিন বসন ছিলো দীনহীনতার চিহ্ন। সুতরাং সে ভাবলো যদি খোদার সাথে মুসা ও তার ভাইয়ের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকে তবে তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বেশী স্বর্ণ, গৌরব ও সম্পদ তাদেরকে দেয়া হতো।

দুনিয়াতে নবীদের প্রেরণের দর্শন ও কেনইবা তাদেরকে পার্থিব বৈভবে সজ্জিত ছাড়াই পাঠানো হয় এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত আলী (আঃ) অত্যন্ত বাস্তব কথা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ যদি নবীদেরকে এসব পার্থিব উপকরণ দ্বারা পাঠাতেন তবে পছন্দের স্বাধীনতা শেষ হয়ে যেত। স্বর্ণ ও অর্থকড়ির মোহে খোদার উপর ঈমান আনাটা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। এ ধরনের ঈমান লোকেরা গ্রহণ করলেও তা সত্যিকার ঈমান নয়। লক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত ঈমানই হচ্ছে সত্যিকার ঈমান। আল্লাহ চাইলে নবীদের ক্ষমতাকে পশু পাখীর উপর বিস্তৃত করতে পারেন, যেমনটা তিনি সোলায়মান (আঃ)-র ক্ষেত্রে করেছিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে যাবতীয় সংশয় দূর করেছিলেন। অলৌকিক কোন বিষয় দেখে ঈমান আনাটা অনিবার্য হয়ে যায়। কিন্তু এ ধরনের কোন ঈমান বুদ্ধিদীপ্ত পছন্দের ফসল নয়। কারণ সত্যিকার ঈমানের ভিত্তি বল প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে হতে পারে না। অলৌকিক কোন বিষয় ততক্ষণই মেনে নেয়া যায় যতক্ষণ না নবীর

২। নাহজুল বালাগাহ, ২য় খণ্ড, Wofis ১৯৭৯ পৃঃ ৪০৬-৪০৭

উপস্থাপিত দাবীর পক্ষ সমর্থন করবে। এর ভিন্নতর কিছু হলে তা স্বেচ্ছাচারিতার কারণ হবে এবং এর দ্বারা সবাই চাইবে তার ব্যক্তিগত কিছু উদ্দেশ্য হাসিল হোক। যেমন লোহাকে সোনায় পরিবর্তন করা ইত্যাদি।

মোটকথা আরো গুরুত্বের সাথে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর যাবতীয় পার্থিব জাঁকজমক, সম্পদ হতে তাঁর নবীদেরকে দূরে রাখেন এবং তাঁরাও এসব জিনিসের পিছনে ঘুরে বেড়ান না। আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে যে শক্তি ও প্রভাব দান করেছেন তা তাঁদের অসীম সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে নিহিত। আর এ কারণে মুসা (আঃ) সাধারণ একটা লাঠি ও তসবীহ নিয়ে ফেরাউনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী সাহস নিয়ে কথা বলেছিলেন। মূলতঃ আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে এমন পূর্ণতা দান করেন যে সামান্য রুজীতেই তাঁরা পরিতৃপ্ত হন। এ পরিতৃপ্তির ফসলই হচ্ছে সাদাসিধা জীবন যা ফেরাউনদের মিথ্যার জমকালো ঝাঁঝালো গৌরবের প্রাসাদকে হাজারো ভাগে চুরমার করে দিতে পারে।

পারস্যসহ বহু দেশ বিজয় করার পরে মেসেডোনিয়ার আলেকজান্ডারকে সর্বসাধারণ মাথা নীচু করে সম্মান জ্ঞাপন করলেও তার যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডায়োজিনিস তা করেননি। ডায়োজিনিসকে মুসলমানরা 'বায়োঝান্ক' বলতো এবং দীওয়ান-ই-শামস-এ মৌলভী (মাওলানা রুমী) তার সম্পর্কে একটা চমৎকার কবিতাও রচনা করেছেন।

শয়তানের ভীড়ে বিরক্ত শায়খ
মশাল নিয়ে খুঁজলেন শহর। মানুষের সন্ধানে।
"মানুষ পাওয়া যাবে না"- বলা হলো তাকে
"আমরাও খুঁজেছি অনেক, পেলাম না কাউকে।"
যদিও মানুষ যায়নি পাওয়া-
তবুও কামনা আমার তাদেরই জন্যে প্রতিক্ষণে"।

যাহোক, সবাই আলেকজান্ডারের সামনে নীত হলো এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো কিন্তু ডায়োজিনিস তা করেননি। এমতাবস্থায় আলেকজান্ডার নিজেই তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলেন। ডায়োজিনিসের কোন বাড়ীঘর ছিল না। একটা বড় গামলার মধ্যে তিনি বাস করতেন। অগণিত সহচরসহ আলেকজান্ডার মরুভূমিতে রওয়ানা করলেন। তাঁর কাছে পৌঁছে লোকেরা দেখলো যে তিনি সূর্যস্নান করছেন। তারা এতো নিকটে পৌঁছলো যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ও মানুষের কোলাহল ডায়োজিনিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি সামান্য সময়ের জন্য উঠে

দাঁড়িয়ে কোন গুরুত্ব না দিয়েই আবার বসে পড়লেন। পরিশেষে আলেকজান্ডার এগিয়ে এলে তিনি দাঁড়িয়ে কতিপয় বাক্য বিনিময় করলেন। তাঁর এ নিঃস্ব জীবনাবস্থা হতে মুক্তির জন্য আলেকজান্ডার কি করতে পারেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "তুমি আমার জন্য ছায়াটা ছেড়ে দিতে পারো যাতে করে আমি সূর্য দেখতে পারি"। আলেকজান্ডার ফিরে আসলেন এবং তার সেনাপতিগণ মন্তব্য করলো যে, ডায়োজিনিস কতো বড়ো বোকা, দুনিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে সে কিছুই চাইল না। কিন্তু ডায়োজিনিসের বিশাল তেজস্বীতায় অপদস্থ হয়ে সম্রাট যা বলেছিলেন ইতিহাসে তা আজও সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি আলেকজান্ডার না হতাম তবে আমি ডায়োজিনিস হতে চাইতাম।" তিনি আলেকজান্ডার হয়েও ডায়াজিনিস হতে চেয়েছেন-এটাই বাস্তবতা।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে নবীরা সাধারণ ও পরিতুষ্ট জীবনের অন্বেষণ করেন খোদার ইচ্ছায়ই। বাহ্যিক জাঁকজমক নয় বরং সরলতা ও আধ্যাত্মিক বিশালতা দ্বারা তাঁরা মানব হৃদয়ে বিজয়ী হন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) দুনিয়ার জৌলুসকে অবজ্ঞা করতেন ও সারাজীবন ধরে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। যেমন, কোথাও বের হবার সময় তিনি তাঁকে পাহারার জন্য সাহাবাদের অনুমতি দিতেন না। ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় তিনি তাঁর পদচিহ্ন ধরে অনুসরণ না করার জন্য বলতেন। তিনি সামনে চলে যাবার জন্যে অথবা দেরীতে আসার জন্যে অথবা সম্ভব হলে তিনি একই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসার জন্যে বলতেন। নিজে ঘোড়ার পিঠে যাবার সময় কাউকে হেঁটে যাবার অনুমতি দিতেন না। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে তা ছিলো অশোভন। সাহাবাদের সাথে কোন সভা চলাকালীন সময়ে সমান সুযোগের সাথে তিনি সকলকে বৃত্তাকারে বসার জন্য বলতেন। অন্যরা নিজেদেরকে তাঁর চেয়ে হীন মনে করতে পারেন এমন কোন বিশেষ স্থানে তিনি বসতেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সাদাসিধা জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং নেতা হিসাবে এগুলো জরুরী মনে করতেন। মুসলমানের নেতাকে ইসলাম জাঁকজমকপূর্ণ হতে নিষেধ করেছে বলে হযরত আলী (আঃ)ও তাঁর খেলাফতকালে একই পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁদের অসাধারণতা ও মহানত্ব আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহীত, বাহ্যিক বেশভূষার ভেতর নয়। একদা আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) তাঁর খেলাফতকালে সাশানীয় সম্রাট আন নওঁশেরার বিখ্যাত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর একজন সহচর অবিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে লেখা একটি আরবী কবিতা আবৃত্তি করে বলেছিলেন যে, রাজা চলে গেলেন কিন্তু তার প্রাসাদ রয়ে গেছে। হযরত আলী (আঃ) তাকে বললেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াতের জন্য-

"ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, যা উহাদের আনন্দ দিত।"

(৪৪ঃ ২৫-২৭)।

হযরত আলী (আঃ) একবার সীমান্তবর্তী দেশ পারস্য সফর করেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে কৃষকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয়রা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এলো। তাদের রীতি অনুযায়ী তারা তাঁর আগে আগে দৌড়াতে লাগলো। হযরত আলী (আঃ) তাদের থামালেন ও দৌড়াবার কারণ জানতে চাইলেন। তারা বললো, "আমরা আমাদের সম্মানিত লোকদেরকে যেভাবে সম্মান জ্ঞাপন করি আপনার জন্যেও তাই করছি।" তিনি বললেন, "এমন কাজে তোমাদের মেহমানদের সামান্যতমও উপকার হবে না। তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করছো। আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমরাতো মুক্ত। সুতরাং কেন তোমরা এমন কাজ করছো?" এভাবেই আমরা দেখেছি কিভাবে হযরত আলী (আঃ) রাসূল (সঃ)-এর মতো নগণ্য সাধারণ জীবন নির্বাহ করতেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) একদিন হুজুর (সঃ)-এর গৃহে হাজির হলেন। এ সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে বলছিলেন দুটো পছন্দের একটি গ্রহণ করার জন্যে। হয় তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করে সাদাসিদা জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে হবে নয়তো তালাক গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাটি ছিলো যে নবী পাক (সঃ)-এর কোন স্ত্রী তাদের অত্যন্ত সাদাসিদা জীবন সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ করে গণিমতের মাল হতে বড় একটা অংশ গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করেন। উত্তরে নবী (সঃ) বললেন যে, শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবনটা এমনই সাদাসিদা হবে; এবং তাদেরকে তা মেনে নিতে হবে। নতুবা তিনি তাদের তালাক দেবেন ও দাবী পূরণ করবেন। তখন তাঁরা সকলেই সাধারণভাবে জীবন যাপনকেই গ্রহণ করে নিলেন। এ বিষয়টা কর্ণগোচর হবার পরেও এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ)-র সিদ্ধান্ত শুনে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেদমতে হাজির হতে চাইলেন। তিনি রাসূল (সঃ)-র কক্ষের দরজায় পৌঁছুলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি তাঁকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিলো। ওমর (রাঃ) তাঁর উপস্থিতির কথা রাসূল (সঃ)কে জানাবার জন্যে লোকটাকে বললেন। লোকটা ভিতরে গেল এবং ফিরে এসে বললো, তিনি কিছুই বলেননি। দ্বিতীয়বারের পরে তৃতীয়বারে হযরত ওমর (রাঃ)কে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। প্রকাশ, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "আমি ভিতরে ঢুকে দেখলাম রাসূলে পাক (সঃ) তাঁর হুজরায় খেজুর পাতার একটা মাদুরের উপর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ মাদুরটাই ছিলো ঘরের একমাত্র

আসবাব। আমাকে দেখে তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। আমি তাঁর পবিত্র দেহে মাদুরের দাগ দেখতে পেলাম। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম এবং জানতে চাইলাম, তাঁকে কেন এভাবে বাস করতে হচ্ছে। যেখানে রোমক সম্রাট সীজার ও পারস্য সম্রাট কাইজার খোদার অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করছে সেখানে খোদার নবী হয়েও কেন তাঁকে এমন সাধারণ জীবন কাটাতে হবে আমার কথাগুলো রাসূলে পাক (দঃ) কে খুবই বিরক্ত করলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তুমি কি বলছো? দুনিয়ার চেহারা কি তোমাকে মোহান্বিত বানিয়ে ফেলেছে এবং তোমার চোখদুটিকে প্রলুব্ধ করেছে? তুমি কি মনে করেছো যে পার্থিব সম্পদের অপ্রতুলতা আমার জন্য বঞ্চনা, আর তার প্রাপ্তি বিরাট নেয়ামত স্বরূপ? খোদার কসম ভবিষ্যতে এসব কিছুই মুসলমানদের দখলে আসবে কিন্তু এতে গর্বিত হবার মতো কিছুই নেই।"

এই ছিলো প্রিয় নবী (সঃ)-এর জীবন। আর ইন্তেকালের সময় তাঁর নিকট পার্থিব এমন কিছুই ছিলো না যা তাঁর একমাত্র কন্যা হযরত ফাতিমা (আঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন। অথচ মানবীয় স্নেহমমতার কারণেই মানুষ সাধারণতঃ তার সন্তানদের জন্য দুনিয়াতে কিছু না কিছু রেখে যায়।

নবী করীম (সঃ) একদিন হযরত ফাতিমার (আঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি (হযরত ফাতিমা) হাতে সুন্দর রূপার অলংকার পরেছেন ও দামী রঙ্গিন পর্দা দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন। কন্যার প্রতি অগাধ স্নেহ ভালোবাসার পরেও তিনি তাঁর বাড়ী হতে কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন। ফাতিমা (আঃ) বুঝলেন এই সাজসজ্জা তাঁর পিতা এতটুকুও পছন্দ করেননি। কারণ তা ছিলো এমন একটা সময় যখন মসজিদে নব্বীর পাশে চালাঘরে গৃহহীন নও মুসলমানেরা বাস করতো। সুতরাং হাতের গহনা ও পর্দাটা তিনি মহানবী (সঃ)-এর খেদমতে নিয়ে যাবার জন্য একজনকে বললেন। ঐ লোক রাসূল (সঃ)-এর সামনে হাজির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার জন্য আপনার কন্যা এগুলো পাঠিয়েছেন।" রাসূল (সঃ) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "আমি তার জন্য জীবন দেয়াকে পছন্দ করবো।"

ফাতিমার বিয়ের জন্য মাত্র একটাই নতুন জামা কেনা হয়েছিলো। তার পুরনোও একটা ছিলো। ঠিক ঐ রাতেই তাঁর দরজায় এক ভিখারী এসে হাজির। বললো, "আমি বিবস্ত্র, এমন কেহ আছেন যিনি আমাকে কাপড় দিতে পারেন?" কেউ তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করলো না। নববধূ ফাতিমা একটু নির্জনে গিয়ে তাঁর নতুন জামাটা খুলে পুরাতনটা পরে নিলেন। নতুনটা তিনি ভিখারীকে দান করলেন। কারণ এ সবের কোনটাই তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপায় উপকরণের প্রয়োগ

নবী জীবনের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটা শিক্ষণীয় দিক হলো লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উপায় উপকরণের সঠিক ব্যবহার। সাধারণভাবে বললে, প্রত্যেক মানুষেরই উচিত জীবনের একটা পবিত্র ও সুন্দর লক্ষ্য ঠিক করা। অধিকন্তু এই লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের উপায় নির্ধারণে তাকে একজন সত্যিকার মুসলমান হওয়া উচিত। জীবনের লক্ষ্যের দিক দিয়ে কেউ কেউ খাঁটি মুসলমান নয়। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগকে কেন্দ্র করে। তারা নিজের ভুবনে ডুবে থাকতে চায়। সত্যিকার মুসলমানতো দূরের কথা তাদেরকে সত্যিকার মানুষও বলা যায় না। কারণ তাদের জীবনের লক্ষ্য মানুষের পাশবিক কামনা বাসনার বাইরে যেতে পারে না, যা একজন সত্যিকার মানুষ সর্বদা এড়িয়ে চলে। খোদার হুকুমকে মেনে চলাই হচ্ছে একজন সত্যিকার মুসলমানের লক্ষ্য।

এই পবিত্র লক্ষ্য অর্জনে স্বভাবতঃই মানুষ কিছু উপায় উপকরণের ব্যবহার করবে। প্রশ্ন উঠে কোন্ ধরনের উপায় উপকরণ সে ব্যবহার করবে। অর্জনের পথ যতই অপবিত্র ও খারাপ হোক না কেন একটা পবিত্র ও ঐশী লক্ষ্য নির্ধারণ করাই কি কারো জন্যে যথেষ্ট? নাকি পবিত্র একটা লক্ষ্যের জন্য পবিত্র কোন পথ দরকার? এখন আমরা সে প্রশ্নের উপর আলোকপাত করবো।

ধরা যাক, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের প্রচার। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোন পথ অবলম্বন করা গ্রহণযোগ্য হবে কি? কখনই না। ঠিক তেমনিভাবে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা বা চাটুকারিতার আশ্রয় নেয়া নিষিদ্ধ। একটি মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যেও মিথ্যা কথা বলে অর্থ বা নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করা ঠিক নয়। হতে পারে অন্যের নিকট তা অত্যন্ত প্রশংসা বা সওয়াবের কাজ। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়াই নিছক মানুষের হেদায়েতের পথ দেখাতে অথবা পরচর্চা ও পরনিন্দা হতে নিরুৎসাহ করার জন্য অথবা ইবাদতের প্রতি লোকদের উৎসাহ জোগাতে নবী বা ইমামদের কোন হাদীস জাল করাটাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলাম এমন পন্থা বেছে নেওয়াকে কখনো অনুমোদন করে না, যদি তা সৎ নিয়তেও করা হয়। কুরআনের একটি বিশেষ আয়াত অমুক ফল দিতে পারে মনে করা অথবা জনমনে বিশ্বাস সঞ্চারিত করার জন্য কোন গল্প বা স্বপ্ন মনগড়া কায়দায় বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। বর্ণিত আছে আবি বিন কা'ব নামের জনৈক ব্যক্তি কুরআনের বিশেষ কিছু আয়াত তেলাওয়াতের সুফল ও নেয়ামত সম্পর্কে একটা হাদীস বর্ণনা করতেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি একা

কেন হাদীসটা বর্ণনা করছেন, অন্য কেউতো করছেন না? তিনি বললেন যে, খোদাকে খুশী করার জন্যেই তিনি এ কাহিনী রচনা করেছেন, "আমি লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন সমাবেশে লোকেরা গালগল্পকাহিনী এবং প্রাক ইসলামী যুগের কবিতা আবৃত্তি করেই সময় নষ্ট করছে। এ সবের বদলে লোকেরা যাতে কুরআন তেলাওয়াত করে আমি তার জন্যে এই হাদীসটি তৈরী করেছি।" ইসলামের দৃষ্টিতে এটি ঠিক নয়, কারণ মিথ্যার ভিত্তির উপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নবী পাক (সঃ) সহ আল্লাহর নবীগণ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে কখনোই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেননি। বরং এ কাজের জন্যে তাঁরা সত্যেরই আশ্রয় নিয়েছেন।

কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভরযোগ্য

কতিপয় মিসরীয় বলার চেষ্টা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন সত্যনিষ্ঠ কোন ইতিহাসের বই নয়। বরং একটা পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এটিতে এমন কিছু গল্পকাহিনী বর্ণনা করেছে (যা সবই সত্য এমন কথা নয়) তার থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে জ্ঞানী লোকদের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর উদাহরণমূলক গল্পকথা বর্ণনা করা হয়েছে। সবাই জানে এগুলো কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। উদাহরণ হিসাবে 'কালিলা ও দিমানা'র কথা বলা যেতে পারে যেখানে মূল চরিত্রগুলো হচ্ছে সিংহ, শিয়াল, খরগোস ও অন্যান্য পশু। যেমন একটা গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে ক্ষুদ্রদেহী কেটা খরগোশ বিশালবপু একটা সিংহকে কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, দৈহিক ও শারীরিক শক্তি জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সমান হতে পারে না। এখন, কিছু লোক আছেন (আল্লাহ মাফ করুন) যারা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সাথে এসব কল্পকাহিনীর তুলনার চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায় কুরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলো ঐতিহাসিক না কাল্পনিক তা নিয়ে বিতর্ক না করে আমাদের বরং উচিত এসব কাহিনী হতে শিক্ষা গ্রহণ করা।

এ যুক্তি হচ্ছে নিতান্তই ভুল ও বোকামী। কারণ সত্যকে উপস্থাপনের জন্যে নবীগণ কখনো অসত্য ও বানোয়াট কল্পকথা ব্যবহার করেন না; এমনকি রূপকথাও নয়। নবুয়্যতের মিশন তা অনুমোদন করে না। কোন একটা পবিত্র লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে আল্লাহর কিতাব, ইসলামের নবী, ইমাম ও অন্যান্য জ্ঞানীর জন্যে ভিত্তিহীন যুক্তির অবতারণা করা একেবারেই অবাস্তব। আমরা মুসলমানরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করি যে, কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনা তার বিষয় ও উপস্থাপনা সবকিছুর দ্বারাই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। কুরআনের এসব ঘটনা প্রমাণের জন্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেবার দরকার নেই। ইতিহাসকেই কুরআনের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

আধুনিক ও প্রাচীন পন্ডিতদের চিন্তার ধরনের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম দল মনে করেন যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্বারাই উপায়ের ন্যায় অন্যায় নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ লক্ষ্য মহান হলে তা অর্জনের জন্যে যে কোন পথ ও পন্থাই ব্যবহৃত হতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এ নীতির সমর্থক। পূর্ব যুগের আলেমগণ একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যা শেখ আনসারী (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন) তার মাকাসিব-ই-মুহাররিমাহ বইতে দু'বার উদ্ধৃত করেছেন। যারা দ্বীনের সাথে সম্পর্কহীন বানোয়াট কোন চিন্তা দ্বীনের সাথে যোগ করে অথবা দ্বীন হতে কিছু বাদ দেয় প্রত্যেকের উচিত তাদের বিরুদ্ধে শক্ত যুক্তি সহকারে দাঁড়ানো এবং মানুষকে তাদের মিথ্যা ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

দ্বীন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যেমন কবিতা, শিল্প ও দর্শনে নতুন কিছু যোগ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু দ্বীনের সাথে নতুন কিছুর সন্নিবেশ করা (বিদা'আত) নিষিদ্ধ। কারণ, না আমরা অথবা নবীর উত্তরাধিকারী ইমামগণ (যারা নবী (সঃ)-র ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেছেন এবং যারা নবী (সঃ)-এর জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ ছিলেন) কেউই দ্বীন ইসলামের প্রবর্তক নই। এমনকি নবী করীম (সঃ) নিজেও এ দ্বীনকে প্রবর্তন করেননি। সত্য হচ্ছে, আল্লাহ জিব্রাঈল (আঃ)-র মাধ্যমে তাঁর নবীর নিকট দ্বীন নাজিল করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে তা প্রচার করেছেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সবিস্তার ব্যাখ্যা দান করেছেন।

ইজতিহাদ

কুরআন ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে কোন বিধি বিধান বের করার প্রচেষ্টাই হলো ইজতিহাদ। একজন মুজতাহিদ (যিনি ইজতিহাদ করেন) তাঁর বা অন্যদের অতীত সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন নতুন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। ইসলামে ইজতিহাদের অনুমোদন রয়েছে। কারণ তা হচ্ছে নতুন একটা অনুসিদ্ধান্ত মাত্র; বিদা'আত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিদা'আত হচ্ছে একটা শক্ত গোনাহ অথচ ইদানীং সর্বত্র তার ছড়াছড়ি। দ্বীনের সাথে যারা কিছু যোগ বিয়োগ ঘটায় তাদের সম্পর্কে একটা হাদীসে বলা হয়েছে, "যে একজন বিদ'আতকারীর সাথে দেখা করলো সে যেন তার দ্বীনকে নষ্ট করলো।" অর্থ হচ্ছে দ্বীনের সাথে মৌলিক কিছু যোগ করেছে বলে দাবীদার কোন ব্যক্তির সাথে দেখা করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আরেকটা হাদীসে বিদ'আতীদের জন্য 'ফাবাহিতুহুম' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বুহ্‌ত্ শব্দটির দু'টি ব্যবহারিক দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে "হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া।" ইব্রাহীম (আঃ) ও তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকের দ্বন্দ্বের কথা বলতে

গিয়ে কুরআন এ অর্থটার ব্যবহার করেছে। কুরআনের ভাষায়-"কাফেরটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল" (২ঃ ৫৮) মনে হচ্ছে ইব্রাহীমের যুক্তির সামনে যে সব ঘাবড়ে গেল। দ্বিতীয় অর্থটা কুরআনে নিন্দা বা মিথ্যা দোষারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

"হে খোদা! তোমার ইজ্জতের শপথ, এতো হচ্ছে স্পষ্ট দোষারোপ।"

মরহুম শেখ আনসারী উল্লেখ করেছেন যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেভাবে নমরূদকে হতবাক করে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনিভাবে শক্ত যুক্তি তর্কের দ্বারা বাতিলের মোকাবিলা করে তাদেরকে হতবুদ্ধি বানিয়ে দেয়া ও দোষী প্রমাণিত করাই হচ্ছে 'বাহিতুহুম'। কারো কারো ধারণা যে হেদায়েতের মোকাবিলায় মিথ্যা বলা বা তাদেরকে অপমানিত করার লক্ষ্যে মিথ্যা দোষারোপ করার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ কোন পবিত্র লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে অপবিত্র পন্থার ব্যবহার। কিন্তু কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ যুক্তি গ্রহণ করতে পারেন না।

মানব আত্মার সমস্যা ও প্রতারণাপূর্ণ চক্রান্তগুলো খুবই বিস্ময়কর। অবচেতন অবস্থা মানুষকে এমন আত্মপ্রতারণার দিকে টেনে নেয় যে নিজেই তা বুঝতে পারে না। যেমন নবী করীম (সঃ)-র জন্মদিনের আগের রাত্রে কেউ একটি গোনাহ্‌র কাজ করল। সে আশা করলো এর দ্বারা নবী করীম (সঃ) খুশী হবেন। অথচ তিনি এ ধরনের গোনাহের আচরণকে তিরস্কার করেছেন।

একটা গল্প আছে। একদিন এক লোক শুড়িখানায় গিয়ে এক পেনী দামের মদ চাইলো। শুড়িওয়ালা বললো, এতো সামান্য মদ তাকে মাতাল করতে পারবে না। লোকটা বললো সামান্য হলেও এর বিষক্রিয়া পরিমাণে অধিক মদের মতোই হবে। সে এতো সামান্য পরিমাণ মদ চাইলো যাতে করে সে মাতলামীর ভান করতে পারে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী তা করাও হয়। আজকের দিনেও এমন লোক পাওয়া যাবে যারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের ভান করে মাত্র। এসব লোক তাদের প্রতিপক্ষকে বিদআতী বলে মনে করে এবং তাদের উপর দিয়ে নিন্দা ও মিথ্যা প্রচারণার তুফান বইয়ে দেয়। তাদের মতে অসত্য হলেও বিদআতীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করার অনুমতি রয়েছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি চলতে থাকলে দ্বীনের অবস্থা কি হবে?

সত্যকে অর্জনের জন্য রাসূল (সঃ) কখনো মিথ্যার সাথে আঁতাতের বা মিথ্যাকে ব্যবহারের অনুমতি দেননি। রাসূল (সঃ)-র প্রদর্শিত পথে চলতেন বলে এসব ক্ষেত্রে হযরত আলী (আঃ)-এর মনোভাবও ছিলো খুবই অনমনীয়। প্রতারণার পথকে তিনি সর্বদাই নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করতেন। কেউ কেউ তাঁর এই নীতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ লক্ষ্যকে অর্জনের জন্য তিনি শুধু সত্য ও আইনানুগ মাধ্যমই ব্যবহার করেছেন।

একবার আরবের একটি গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল রাসূল (সঃ)-র খেদমতে হাজির হয়ে বললো তিনটি শর্তের উপর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী আছে। (১) যদি তাদেরকে আরো এক বছর মূর্তি পূজার অনুমতি দেয়া হয়। (২) খুবই কষ্টদায়ক বলে যদি নামাজ হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়। (৩) যদি তাদের বড় মূর্তিটা নিজ হাতে ভাঙ্গা হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়। নবী করীম (সঃ) বললেন, "প্রথম দু'টো শর্তের সাথে তিনি একমত নন তবে তৃতীয়টা গ্রহণ করা যেতে পারে।" ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়বে আরবের এমন একটা গোত্র হাতছাড়া হয়ে যাক কখনো এমন চিন্তা নবী করীম (সঃ) করেননি। তাই বলে তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একটা বছর তাদেরকে মূর্তি পূজার অনুমতি দিতে পারেন না। প্রথম দু'টি শর্ত গ্রহণ করার মানে হতো তিনি মূর্তি পূজাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যা একদিনের জন্যেও সম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবেই ঈমান গ্রহণের পরে তারা এক বছর বা বরং একদিনের জন্যেও যদি নামাজ হতে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করতো তাহলে তাতেও তিনি কখনো রাজী হতেন না।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কিছু লোক শুধু অপবিত্র ও অবৈধ উপায়ই ব্যবহার করে না অধিকন্তু তারা হক ও দ্বীনের সমর্থনে ও শক্তি যোগাতে অন্যদের মূর্খতা ও অসাবধানতাকে কাজে লাগাবারও প্রয়াস পায়। যেমন একটা বানোয়াট কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার সময় ইমাম সাজ্জাদের মোহতারেমা মা জীবিত ছিলেন এবং তিনি কারবালাতেই উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই এ গল্পে বিশ্বাসী। অথচ ইতিহাস বা হাদীসের বইগুলোতে বলা হয়েছে যে তিনি শিশু সন্তান (ইমাম)-র ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই ইন্তেকাল করেন। গল্পের সমর্থনে একটিও কথা নেই। তারপরও কিছু কিছু তথাকথিত ধার্মিক মনে করেন যেহেতু অনেকেই বিষয়টার উপর বিশ্বাসী সেহেতু সত্য বা মিথ্যা যাই হোক তা সর্বস্তরে চালু করে দেয়া দরকার। এটা একটা ভ্রান্তি। সাধারণ মানুষকে এ ধরনের অজ্ঞতার গভীর তমশা হতে জাগানোর দায়িত্ব আমাদের। এটা ছিল নবী করীম (সঃ)-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হযরত আলীর (রাঃ) ভাষায়-

> "নবী করিম (সঃ) ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকের মতো, তিনি তাঁর ঔষধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম তৈরী রাখতেন। অন্ধ হৃদয়, বধির কর্ণ অথবা বোবাদের জন্য যখনই প্রয়োজন হতো তিনি তা প্রয়োগ করতেন। তিনি তাঁর ঔষধ সামগ্রী নিয়ে অচেতন ও অবহেলিত মানুষকে অনুসরণ করতেন। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞার মশাল হতে অনেকেই আলো নেয়নি। অথবা আলো জ্বালেনি তাঁর জ্ঞানের পরশ পাথর হতে। তারা যেন চরে বেড়ানো চতুষ্পদের মতো অথবা শক্ত কোন পাথর।"

নবী করিম (সঃ) অবস্থা বিশেষে বল প্রয়োগ করেছেন। আবার অনেক সময় আধ্যাত্মিক রোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা করেছেন। তার মানে হলো অবস্থা বাধ্য করলে তিনি দৃঢ়তার সাথে কঠোর হতেন। আবার কোন কোন সময় মোলায়েম আচরণ করতেন। তাঁর এ দু'টি রূপই ছিল মানুষকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে। মূলতঃ জনগণকে জাগানোর জন্য তিনি নৈতিক নীতিমালা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর তরবারীর (ক্ষমতা ও শক্তি) ব্যবহারের লক্ষ্য ছিল এ সবের বৃদ্ধি ও উন্নতি।

নবীপুত্র ইব্রাহীম

ইব্রাহীম ছিলেন নবী করীম (সঃ)-র স্নেহের পুত্র। তিনি মহানবীর স্ত্রী মরিয়ম কিবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আঠার মাস বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। একজন অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হিসেবে মহানবী (সঃ) শোকাতুর হয়ে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বলছিলেন, "হে ইব্রাহীম! আমাদের হৃদয় টুকরো হয়ে গেছে। তোমার শোকে আমরা অশ্রু সংবরণ করতে পারছি না। কিন্তু খোদার ইচ্ছার উপর আমরা কোন কথা বলতে পারি না।" মহানবী (সঃ)-র শোকে শোকাতুর হলো সমস্ত মুসলমান। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই সূর্য গ্রহণ। মুসলমানরা আকাশরাজ্য, দুনিয়া ও মহানবী (সঃ)-র শোকের মধ্যে একটা যোগসূত্র ধরে নিয়েছিলো। নবী পুত্রের ইন্তেকালে সূর্য গ্রহণ ঘটেছে বলে তারা বিশ্বাস করে ফেলেছিলো।

এটি এমন কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। নবী (সঃ)-এর জন্য সারাটা দুনিয়াও ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। তারপরও গুজব জন্ম নিল, মদীনার নর-নারী নির্বিশেষে সবাই সূর্য গ্রহণের মাঝে রাসূল (সঃ)-এর হৃদয়ের শোককে আবিষ্কার করলো। মহানবীর প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। যাহোক নবী করীম (সঃ) মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চাননি। বরং দ্বীনের দাওয়াতের জন্য তিনি শক্তিশালী যুক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকেই ব্যবহার করতেন। কারণ কুরআন তাঁকে হুকুম দিয়েছিল-

> "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে এবং তাদের সহিত আলোচনা কর সদ্ভাবে-" (১৬ ঃ ১২৫)

লক্ষ্য হাসিলের জন্যে সম্ভাব্য যে কোন রকম উপায়কেই তিনি বেছে নিতে চাননি। সুতরাং তিনি মিম্বরে দাঁড়ালেন ও জনগণকে বললেন, "আমার পুত্রের

মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হয়নি।" এভাবে তিনি এই অযৌক্তিক ব্যাখ্যার মূলোৎপাটন করলেন। নীরবতা পালন করে এসব ব্যাখ্যা হতে নিজের ফায়দা হাসিলের কাজ তিনি করেননি। কারণ ইসলামে এ ধরনের ধূর্তামীর কোন স্থান নেই। যাদের দ্বীনের যৌক্তিক কোন ভিত্তি অথবা সুস্পষ্ট নিদর্শন নেই শুধুমাত্র তারাই এসব উপকরণ ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ যারা এসব চালাকী হতে মতলব হাসিল করে শেষে তারাই বিপদে পড়ে। একটি প্রবাদ আছে কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্যে বা সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানানো যেতে পারে, কিন্তু সব মানুষকে চিরকালের জন্য বোকা বানানো সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ নিজেও এমন কাজ করার অনুমতি দেন না। হককে পাবার জন্য হক পথই ধরতে হবে। হক ও বাতিলকে একত্রিত করলে হক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাতিলের উত্থানে হক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এক শহরে একজন নামকরা আলেম শুনলেন যে জনৈক সাইয়্যেদ কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার উপর মিথ্যা বানোয়াট গল্প ছড়াচ্ছে। উল্লেখিত আলেম এর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "আপনি কিসব বলে বেড়াচ্ছেন?" উত্তরে সাইয়্যেদ বললেন, "আপনি আপনার দ্বীনের ফিকাহ ও আকায়েদ নিয়ে থাকুন আমার পূর্ব পুরুষ হযরত হোসায়েন (আঃ) সম্পর্কে যা পছন্দ করবো তাই করার স্বাধীনতা আমার রয়েছে।" আমাদের দ্বীনের জন্য এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নভাবে খুবই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি সৎ ও পবিত্র হয়ে থাকে তবে তা অর্জনের জন্য আমাদের গৃহীত পদক্ষেপও সৎ ও পবিত্র হতে হবে। ব্যক্তি বা দ্বীনের কারো খাতিরেই আমাদের উচিত নয় মিথ্যা বলা, গীবত বা কারো উপর মিত্যা দোষারোপ করা।

দ্বীনের জন্য মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অপবাদ দেয়া মূলতঃ এমন কাজ যা দ্বীন নিজেই নিষিদ্ধ করেছে। আমাদের উচিত আমাদের ইমামদের জীবনের প্রতি তাকানো। আমরা দেখবো কিভাবে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন। সিফফিনের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (আঃ) মুআবিয়ার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে মুআবিয়া দেখলেন যে ইউফ্রেটিস নদীর পানি হযরত আলী (আঃ) বা তাঁর সৈনিকদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে না। হযরত আলী (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা পানি হতে উঠে আসলেন এবং মুআবিয়াকে একটা খবর পাঠিয়ে বললেন, "তিনি সেখানে শালিশীর অপেক্ষা

করছেন।" বললেন, "আল্লাহ হয়তো তাদেরকে মুসলমানদের সমস্যাগুলো সমাধানে সাহায্য করবেন।" অতঃপর তাদেরকে ইউফ্রেটিসের পানি পর্যন্ত যাবার অনুমতি চেয়ে তিনি মুআবিয়াকে অনুরোধ জানালেন। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এটি একটি কৌশল বিবেচনা করে মুআবিয়া হযরত আলী (আঃ)র অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করলেন। মুআবিয়ার মনোভাব বুঝতে পেরে হযরত আলী (আঃ) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণের হুকুম দিলেন। গোধূলী লগ্নে মুআবিয়ার সৈন্যদেরকে তাদের অবস্থান হতে হটিয়ে ইউফ্রেটিসের দখল হযরত আলী (আঃ)র সৈন্যদের হাতে এসে গেল। হযরত আলী (আঃ)-এর সৈন্যরা মুআবিয়ার সৈন্যদেরকে পানি নেওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে চাইলো যেমনটা মুআবিয়া করেছিল। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) বললেন,

> "আমরা এমন কাজ করবো না কারণ আল্লাহ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্যই সমানভাবে পানি দান করেছেন। এমন কাজ করলে তা হবে অমানবিক। এ ধরনের নীচু কৌশল দ্বারা আমরা যুদ্ধ জয় করতে চাই না।"

আশুরার দিন সীমার নামে জঘন্য দুষ্ট প্রকৃতির এক লোক যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে গেল। যে কোন সুযোগে হামলা চালাতে সে তাঁবুগুলোর পিছনে গিয়ে অবস্থান নিয়ে নিল। কিন্তু সে বুঝতে পারলো না যে হযরত হোসাইন (আঃ) ইতিমধ্যেই তাঁর তাঁবুগুলো দাঁড় করে ফেলেছেন। তাঁবুগুলো পরস্পর সন্নিবেশিতভাবে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো হয়েছিলো এবং সামনে একটা জ্বলন্ত আগুনের খন্দক থাকায় তার ভিতরে প্রবেশ করাটা ছিলো রীতিমতো অসম্ভব। এসব দেখে সীমার প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গালাগালি শুরু করে দিলো। ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর একজন লোক তাকে এক আঘাতে হত্যা করার জন্যে অনুমতি চাইলে তিনি তাতে রাজী হননি। সীমারের দুশ্চরিত্রতা সম্পর্কে হযরত হোসাইন (আঃ) কিছুই জানেন না ভেবে লোকটি বললো, "আমি জানি সে কত নিষ্ঠুর মানুষ।" ইমাম বললেন, "আমিও তাকে জানি।" লোকটি বললো, "তাহলে তাকে হত্যা করার জন্যে কেন অনুমতি দিচ্ছেন না?" উত্তরে হযরত হোসাইন (আঃ) বললেন, "পরস্পর বিবদমান দু'টো দল আমরা মুখোমুখি হয়েছি। তারপরও আমি এ যুদ্ধের প্রথম আক্রমণকারী হতে চাই না। তারা আক্রমণ শুরু করার আগে আমি এ যুদ্ধ শুরু করবো না। কারণ আমি কুরআনের এই ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

"পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তাঁর জন্যে কিসাস। সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।" (২ ঃ ১৯৪)

সিফফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (আঃ)ও এ আয়াতটি স্মরণ করে বলেছিলেন, তিনি যুদ্ধ শুরু করবেন না, শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন।

উপরের ঘটনাতে আমরা ইমামের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারি। এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও ইসলামী নীতিমালার উপর তাঁদের চিন্তাভাবনা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদিও শত্রুরা কখনো এমনভাবে চিন্তা করেনি।

তখন সুবেহ্সাদেক হয়ে আসছিল। ইমাম হোসাইন (আঃ) তাঁর সৈন্যদের অবস্থান ঠিক করছিলেন। তিনি পতাকা বহনকারী নিয়োগ করলেন এবং এতে ভ্রুক্ষেপও করেননি যে তাঁর দুশমনদের বাহিনী ত্রিশ হাজার সৈনিক দ্বারা গঠিত। অথচ তাঁর সঙ্গী মাত্র বাহাত্তর জন। যুহাইরকে ডান দিকে ও হাবিব বিন মাজাহিরকে বাম দিকের কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হলো। তাঁর ভাই আবুল ফজল পতাকা উত্তোলন করলেন এবং সাহসের সাথে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করলেন। অপরদিকে শত্রুরা সাহসিকতা বা ভীরুতার তোয়াক্কাই করলো না। পার্থিব ধনদৌলত ও রে অঞ্চলের গভর্নর হবার লোভ উমর বিন সা'দকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। তার লোভকে চরিতার্থ করার জন্য সে ওবায়দুল্লাহ্ বিন জিয়াদকে সন্তুষ্ট করাকেই তার লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিল। ইমামের তাঁবু লক্ষ্য করে সে-ই প্রথম তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তার সঙ্গীদের প্রতি তাকিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে, "হে সৈন্যরা তোমরা সাক্ষী থেক, আমিই প্রথম তীরটি নিক্ষেপ করলাম।"

তার চার হাজার তীরন্দাজ অবিরামভাবে ইমাম ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। ইমামের সাথে মাত্র জনাকয়েক তীরন্দাজ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। ইমামের পক্ষের যারাই শহীদ হচ্ছিলেন তাঁরা অপরপক্ষের কয়েকজনকে খতম করে দিচ্ছিলেন। সম্ভবতঃ ইমামের সঙ্গীদের অনেকেই এ সময় শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় যে ইমামের পক্ষ হতে আক্রমণ শুরু হয়নি। উমর বিন সা'দের তীর দিয়েই আশুরার যুদ্ধ শুরু হয় আর তার তীর দিয়েই আহত ইমাম তাঁর ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার মাধ্যমে তা শেষ হয়।

আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আঃ)

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "স্মরণ কর আমাদের বান্দাহ দাউদ (আঃ) যখন মিম্বরে উপবিষ্ট ছিল, হঠাৎ উপর হতে বিবদমান দু'টি দল এসে হাজির হলো।" দৃশ্যতঃ মনে হয় সেখানে অবশ্যই কমপক্ষে দু'এর অধিক লোক ছিলো। যদিও কুরআনের একটি আয়াতে সেখানে একজন লোকের কথা বলা হয়েছে।

"নিশ্চয়ই এ আমার ভাই। এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি" (৩৮ ঃ ২৩)

কোনো কোনো বর্ণনায় অবশ্য এখানে একাধিক, সম্ভবতঃ দশজনের অধিক লোকের উল্লেখ আছে। হযরত দাউদ (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী, একজন বাদশাহ ও তাঁর গোত্রের শাসক। উল্লেখিত দু'জন তাঁর কাছে আসলো। একজন তাঁর নিজেরই গোত্রের। সে এসে তাঁর ভাইয়ের সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক হয়েও সে তার সম্পদ একটি মাত্র দুম্বা নিয়ে নিতে চাচ্ছে। সে দাউদের (আঃ) কাছে সুবিচার প্রার্থনা করলো।

আল কুরআনে অভিযোগটির উল্লেখ থাকলেও বিবাদীর কোন বক্তব্য উল্লেখ নেই। বরং শুধুমাত্র হযরত দাউদ (আঃ)-এর কথাই উদ্ধৃত হয়েছে।

"দাউদ বললো, তোমরা দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে জুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে-করে না কেবল মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারলো আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং তাঁর দিকে নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।" (৩৮ ঃ ২৪-২৫)

এখানে আমরা দু'টি প্রশ্নের সম্মুখীন হই-

১। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট আগতরা কারা? তারা কি মানব জাতির কেউ এবং এ ঘটনা কি সত্য? অথবা তারা কি হযরত দাউদ (আঃ) কে পরীক্ষার জন্য খোদার কাছ থেকে পাঠানো ফেরেশতা ছিলেন? এক্ষেত্রে পুরো ঘটনাটিই ভিত্তিহীন বা বানোয়াট হবে কারণ সেখানে আদতে কোন দুম্বাই নেই বা ভাই থাকার কথা নয় যারা পরস্পর বিবাদ করেছে। তারা নিশ্চয়ই দাউদ (আঃ) কে

পরীক্ষার জন্য এসেছিলেন এমন আভাস পেয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু কিছু সুন্নী ভাষ্যকারের মতে দাউদ (আঃ)-এর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলো। একদিন তিনি মেহরাবে ইবাদতরত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় শয়তান একটি সুন্দর পাখীর (কবুতর) আকৃতিতে মেহরাবের পাশে জানালায় এসে বসলো। পাখীটি এত সুন্দর ছিলো যে, দাউদ (আঃ) তাঁর নামাজ ছেড়ে পাখীটিকে ধরার জন্য ছুটে গেলেন। পাখীটি একটু দূরে উড়ে গিয়ে বসলো। দাউদ (আঃ) আবার চেষ্টা করলেন। পাখীটি আবার উড়ে গিয়ে ছাদের উপর বসলো। দাউদ (আঃ) পাখীটির পেছনে ধাওয়া করে ছাদে উঠলেন, ঠিক ঐ মুহূর্তে তাঁর একজন সৈনিকের উরিয়া নামে এক স্ত্রী গোছল করছিল এবং তিনি তাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। উরিয়া ছিলো খুবই সুন্দরী ও দাউদ (আঃ) তাকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলেন। অতঃপর তিনি পরিচয় জানতে চেয়ে শুনলেন যে, মহিলার স্বামী তারই একজন সৈন্য এবং সে ঐ সময় যুদ্ধের ময়দানে আছে। দাউদ (আঃ) সেনাপতিকে লিখলেন ঐ সৈন্যটিকে যুদ্ধের প্রথম সারিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য যাতে করে তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়। সেনাপতি তাই করলো এবং সৈনিকটিও মারা গেলো। মহিলাটি বিধবা হবার পরে তার ইদ্দত শেষ হলে দউদ (আঃ) তাকে বিয়ে করলেন। ফেরেশতারা তাকে এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিও ঐ ভাইয়ের মতো যার নিরানব্বইটি দুম্বা থাকলেও যে অন্য ভাইয়ের একটি মাত্র দুম্বা চেয়েছিলো। এভাবে দাউদ (আঃ) বুঝলেন যে তিনি একটি ভুল করে ফেলেছেন। তিনি তওবা করলেন। এবং আল্লাহ্ তাঁর তওবা কবুল করলেন।

উয়ুন আল আখবার আলরিদা-র বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের প্রতিনিধির সাথে ইমাম রেজার (আঃ) একটা ধর্মীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। মামুনের উপস্থিতিতে খৃষ্টান, ইহুদী, জোরোস্তা এবং মুসলমানদের বিভিন্ন মাজহাবের প্রতিনিধি তাতে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত দাউদের ঘটনা সম্পর্কে ইমাম রেজা মতামত জানতে চাইলে জনৈক সুন্নী আলেম উপরে বর্ণিত ঘটনার মতোই বর্ণনা দেন। এরপর ইমাম রেজা বললেন ঃ

> "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্র একজন নবী সম্পর্কে তুমি এমন কথা কিভাবে বললে? যিনি একটা সুন্দর পাখী দেখে নামাজ ভেঙ্গে ফেলেন ও চরম আকর্ষণে পাখীটির পিছনে পিছনে ছাদ পর্যন্ত ধাওয়া করেন। তিনি কেমন নবী? পাখীটি ধরার মতো অন্য কেউ কি সেখানে ছিল না? তিনি কেমন নবী যিনি একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখে পাখীটির কথা ভুলে তার প্রেমে পড়ে

যান? তিনি যখন শুনলেন যে মহিলার স্বামী একজন ত্যাগী সৈন্য ও ময়দানে যুদ্ধ করছেন তখন কিভাবে শুধু মহিলাকে বিবাহ করার জন্য তাকে হত্যা করার কৌশল নেন? এগুলো তো লাম্পট্য ও দুরন্তপনা। একজন নবী কিভাবে এ কাজগুলো করতে পারেন?"

তারা ইমামকে প্রকৃত তথ্য জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেনঃ

এই কথাগুলো কুরআনে বর্ণিত হয়নি। ঘটনা হলো, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর জ্ঞান ও সুবিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একদিন তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি সহকারে মনে মনে বলছিলেন আমার ফয়সালাই হলো সর্বোত্তম। আমার ফয়সালা এতই নির্ভুল যে, কেউ তার ভিতরে এতটুকু ত্রুটি খুঁজে পাবে না। হযরত ইউনুস (আঃ) ও আদম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এই সামান্যতম আত্মতৃপ্তি খোদার রহমতকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলো। কিন্তু উপরোক্ত বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর এই ত্রুটি হয়ে গেলো যে তিনি অপর পক্ষের কথা না শুনেই এক পক্ষের কথার ভিত্তিতে রায় দিতে যাচ্ছিলেন।

মহানবী (সঃ) তাঁর মুনাজাতে বলতেনঃ

"হে খোদা তুমি আমাকে একটা মুহূর্ত অথবা চোখের একটা পলকের জন্যও আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।"

উম্মে সালমাহ (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে, একদিন রাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে তাঁর বিছানায় খুঁজে পাওয়া গেলো না। ঘরের এক কোণায় তাঁকে পাওয়া পর্যন্ত তিনি খুব দুশ্চিন্তগ্রস্ত ছিলেন। ঐ সময় উম্মে সালমাহ শুনলেন নবী করীম (সঃ) দোয়া করছেনঃ

"হে খোদা; আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার পরে তুমি আমার কাছে গোনাহ্‌কে আগাতে দিও না। এমন কাজ আমাকে দিয়ে করাইও না যাতে শত্রুরা সন্তুষ্ট হয়। হে খোদা, তুমি একটা মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার উপর ছেড়ে দিও না।"

হযরত উম্মে সালমাহ্ (রাঃ) এ অবস্থায় কাঁদতে শুরু করে দিলেন। নবী করীম (সঃ) মুনাজাত শেষ করে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সালমাহ্ (রাঃ) জানালেন, "আপনি যখন এত করুণভাবে ফরিয়াদ করছেন তখন খোদার রহমত না পেলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে?" উত্তরে রাসূল (সঃ) বললেন, "হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভাই ইউনুসকে আল্লাহ্ মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিলেন। তুমি তো জানো এতে তাঁর কি অবস্থা হয়েছিলো।" নবীদের ভিতর সামান্যতম অহংকারও তাদেরকে খোদার রহমত হতে বঞ্চিত করতে পারে। ইমাম রেজা বলেনঃ

"হযরত দাউদ (আঃ) ভাবলেন যে সারা দুনিয়াতে তাঁর চেয়ে আর উত্তম কোন বিচারক নেই। এই আত্মতৃপ্তি তাঁকে রোগাক্রান্ত বানিয়ে দিলো এবং খোদার বিচারে তিনি তাঁর আনুকূল্য হারিয়ে ফেললেন?"

তিনি ভুলে গেলেন যে যখন কোন ব্যক্তি কোন ফরিয়াদ নিয়ে আসে তখন তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলা বিচারকের জন্য ঠিক নয়। কিন্তু আমরা দেখছি, এক ব্যক্তি এসে বললো যে তার ভাই তার চেয়ে অনেক ধনশালী ও নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক হয়েও তার একমাত্র দুম্বাটি সে দাবী করছে। এমতাবস্থায় হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর স্বাভাবিক মানবিক ভাব প্রবণতাই প্রকাশ করলেন। অপরপক্ষের বক্তব্য না শুনে বা কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করেই তিনি বললেন, "যদি ঘটনাটা তোমার বক্তব্য মতোই হয় তবে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে।" এ কথা বলার পর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল সত্যিকার সুবিচারের জন্য উভয় পক্ষে বক্তব্য শুনেই সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। তিনি বুঝলেন যে নিজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী। অতঃপর ইমাম রেজা বললেন, "তোমরা যা বলছো ঘটনাটা এ রকম নয়। কুরআনের বর্ণিত কাহিনীটিতে কোন উড়ে আসা সুন্দর পায়রা অথবা সুন্দরী কোন নারীর কথা নেই।"

এখন আমাদের দেখা উচিত কিভাবে এ ঘটনাটি ইহুদীদের দিয়ে বিকৃত হয়েছে এবং মুসলমানদের কিতাবগুলোতে স্থান পেয়েছে। আমি শুধু একটুকুই বলতে পারি খোদা দুনিয়াতে ইহুদী এবং তাদের অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপ হতে আমাদের রক্ষা করুন।

কুরআন ইহুদীদের সম্পর্কে যে কথাটি সুস্পষ্টভাবে বলছে তা হলো তাদের দ্বারা বিভিন্ন ঘটনার বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন; যা তারা অদ্যাবধি করছে। জাতি হিসেবে তারা বুদ্ধিমান অথচ ধূর্ত। দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে। তথ্য, ইতিহাস, ভূগোল ও সংবাদ বিকৃতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে অধ্যয়ন করলে তাদের অপকর্মের খতিয়ান বের হয়ে আসবে। আজকের দুনিয়তে তারা সারা দুনিয়ার সংবাদ মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ তা হচ্ছে প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যেখানেই সম্ভব সেখানে তারা গণ মাধ্যমগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। অতঃপর তারা এসব দেশের জনগণের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করে। এ কাজটা তারা শুধু ইদানীংই করছে না। বরং শুরু হতেই তারা এ কাজ করছে। কুরআনের ভাষায়-

"তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে।-যখন তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে ও বুঝার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করতো।" (২ ঃ ৭৫)

হে মুসলমানরা। তোমরা এসব ইহুদীর কাছ হতে কি চাও! তোমরা কি তাদেরকে জানো না? তারা এমন জাতি যে হযরত মুসা (আঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই তারা তাদের সুবিধামত খোদার কালামকে বিকৃত করেছিলো। এ কাজ তারা অজ্ঞতাবশতঃ করেনি বরং সচেতনভাবেই করেছিলো। এখনও তারা একই কায়দায় সে অপরাধগুলো করে যাচ্ছে। নিজেদের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে তারা হাজার বছর হতেই ঘটনাপ্রবাহের বিকৃতি সাধন করে আসছে। বিভিন্ন ছদ্মাবরণে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় তারা উত্থিত হয়, ওই জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের ধ্যান ধারণাকে প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিরোধ তৈরী করার জন্য সুচতুরভাবে তারা যে কোন এক পক্ষের কোন কোন কথার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনে দেয় যাতে করে অপর পক্ষের বক্তব্যের সাথে তা সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদের ফট কর্ণটবণর্ড-কে মিথ্যায় ভরে রেখেছে। যেমন অতীত জাতিসমূহের ইতিহাসের উপর তারা বানোয়াট গল্প রচনা করেছে। পবিত্র কুরআন তাদের ভ্রান্ত ও কাল্পনিক গল্পগুলোকে প্রকাশ করে দিয়েছে। কুরআনের কথাগুলো খণ্ডন ও ফট কর্ণটবণর্ড-এ নিজেদের বানানো কাহিনীগুলোর সমর্থনে তারা নবী করিম (সঃ) ও তাঁর আহলে বায়েতদের সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে যাতে করে সর্বসাধারণ তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, যে আমালিকারা একবার বর্তমান জেরুজালেম দখল করেছিলো হযরত মুসা (আঃ) ইহুদীদেরকে বললেন তাদের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদা সহকারে অধিকার আদায়ের জন্যে সেখানে গিয়ে লড়াই করার জন্যে। কিন্তু তারা বললঃ

"হে মুসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সে স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশই করবো না; তারা সে স্থান হতে বের হয়ে গেলেই আমরা প্রবেশ করবো। যারা ভয় করছিলো, তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বললো, 'তোমরা তাদের মোকাবিলা করে দ্বারে প্রবেশ কর, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে, আর তোমরা মুমিন হলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর।' তারা বললো, হে মুসা! তারা যতোদিন সেখানে থাকবে ততোদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবোই না; সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব।" (৫ ঃ ২২-২৪)

জাতি হিসাবে ইহুদীরা ছিল খুবই অলস ও লোভী। বিনা পরিশ্রমেই তারা অনেক কিছু আশা করতো। এবং মুসা (আঃ)-র উৎসাহ সত্ত্বেও তারা জিহাদে অবতীর্ণ হতে রাজী হয়নি। অন্যদিকে বদরের যুদ্ধের সময় হযরত মেকদাদ (রাঃ) রাসূল করীম (সঃ)কে বললেন,

"হে রাসূলুল্লাহ্! আমরা তো ইহুদীদের মতো নই যারা বলেছিলো, তুমি ও তোমার খোদা জিহাদ করো। তোমরা বিজয়ী হলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যোগ দেব। বরং আমরা আপনারই হুকুমসমূহের আনুগত্য করি। আপনি আমাদেরকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেও আমরা তা করবো।"

ইহুদীদের সম্পর্কে কুরআনের সমালোচনাকে খণ্ডন ও মুসলমানদের আরো বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রয়াসে তারা 'আমালিকা'দের সম্পর্কে গল্প আবিষ্কার করে। তারা দাবী করে যে জেরুজালেমে 'আমালিকা'রা সাধারণ কোন মানব ছিল না। বরং তারা ছিল 'আনাক' নামে এক মহিলার সন্তান। বসতে গেলে আনাকের দশ একর (১৪০০ বর্গগজ) পরিমাণ জায়গার দরকার হতো। উদ নামে তার একটা ছেলে ছিলো সে এত প্রকাণ্ড ছিল যে মুসা নিজের চল্লিশ হাত উচ্চতা, চল্লিশ হাত লাঠি ও চল্লিশ হাত লাফ মেরেও শুধুমাত্র তার টাকনুতে আঘাত করতে পারতো।

গল্পে আরো বলা হয়েছে যে 'আমালিকা'দের একটা দল জেরুজালেমের মরুভূমিতে এলো। তারা কারা ও কি করছে জানার জন্যে হযরত মুসা (আঃ) সেখানে কয়েকজন লোক পাঠালেন। লোকেরা এসে বললো, "তারা বহু কিলোমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট মানুষ। তারা সাগরে হাত দিয়েই মাছ ধরে নিয়ে আসে ও সূর্যের সাথে ধরে তা রান্না করে। এদের একজন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট কিছু প্রাণীকে চলাফেরা করতে দেখতে পেলো। মূলতঃ এরা ছিলো হযরত মুসা (আঃ)-র লোক। সে এদের ক'জনকে ধরে আস্তিনে ভরে তাদের রাজার কাছে নিয়ে আসলো। রাজার সামনে সে ধরে বললো, "দেখুন, এই লোকগুলোই তারা, যারা এ দেশকে পূর্ণ দখল করতে এসেছে।"

এমন লোক যদি সত্যি জেরুজালেমে বাস করতো তাহলে সে দেশ দখলের জন্য নিজ লোকদেরকে হুকুম দেয়ার কোন অধিকারই হযরত মুসা (আঃ)-এর থাকতো না। বস্তুতঃ কুরআনে ইয়াহুদীদের কাপুরুষতার সঠিক সমালোচনার পরোক্ষ জবাব দানের জন্যই ইহুদীরা এসব গালগল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

আমরা একটি পাখী, উরিয়ার স্ত্রীর প্রতি হযরত দাউদ (আঃ)-র প্রেম, উরিয়ার হত্যার বিষয়গুলো হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কিত গল্পে দেখতে পাই। বনী ইসরাইলা মূলতঃ এসব গল্পের রচনাকারী যা পরে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট

হয়েছে। এখানেই আমরা ইমামের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। অষ্টম ইমাম ইহুদীদের মিথ্যার বেসাতি ফাঁস করে দিয়েছেন। কারণ তিনি বলেছেন কুরআনে বর্ণিত হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা অসত্য নয়। বরং কুরআনে যা কিছু নাজিল হয়েছে তা কোন রূপকথা নয় বরং সত্যিকার ঘটনা। হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে যারা এসেছিলেন তারা তাঁর মধ্যে সুবিচারের চেতনা জাগানোর জন্য আসেননি বরং তাতে তিনি জাগ্রত হয়েছেন। যদি কেউ বলেন যে, এ লোকগুলো ছিলো ফেরেশতা তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় দাউদ (আঃ)কে জাগাতে ফেরেশতারা কিভাবে এ কাজ করলো? নিঃসন্দেহে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো খুবই পবিত্র। কিন্তু পুরো গল্পটাই তো সাজানো। এক্ষেত্রে আল্লামা তাবাতাবাইর তাফসীরে আল-মিজানের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা উচিত। তিনি লিখেছেন এই লোকগুলো ফেরেশতা ছিল কিনা এ ব্যাপারে আমরা কেউই নিশ্চিত নই। আমরা যদি ধরেও নেই যে তারা ছদ্মবেশী ফেরেশতা ছিলো তাহলে তা হবে বাস্তব দুনিয়াতে একটা রূপকথা বানানোর চেয়ে ভিন্নতর। মূলতঃ আমাদের দায়িত্ব হলো সত্য বলা এবং মিথ্যা না বলা। এবং পরিষ্কার করে বলা "এটা সত্য" "ওটা মিথ্যা।"

এই বস্তু জগতে যদি দু'জন লোক এসে হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে তার মানে হবে যে পবিত্র কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা "কিতাব বহির্ভূত" কোন উপকরণের ব্যবহার করেছে। কিন্তু উপদেশমূলক কাহিনী হলো ভিন্ন, যেখানে একটা ঘটনাকে ছদ্মাবরণে পেশ করা হয়। যেমন সত্যিকার কোন স্বপ্ন সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সত্য স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু অন্যায় উপায় গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় রাসূল (সঃ) একদিন স্বপ্নে দেখলেন, একদল বানর তাঁর মসজিদের মিম্বরে উঠানামা করছে। আর মিম্বরমুখী মুসলমান দর্শকরা ক্রমান্বয়ে দূরে সরছে। তিনি প্রচণ্ড দুঃখ ও মানসিক অস্বস্তির মধ্যে জাগ্রত হলেন এবং তাঁর স্বপ্নকে এমন একটা আঘাতের ইঙ্গিত মনে করলেন যা শ্রীঘ্রই ইসলামী বিশ্বের উপর আপতিত হবে। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাজির হলেন এবং স্বপ্নটির ব্যাখ্যা দিলেন-

> "আর এই যা কিছু এখনই তোমাকে দেখালাম ইহাকে এবং এই গাছটিকে কুরআনে যাকে অভিশপ্ত করা হয়েছে আমরা এই লোকদের জন্য একটি ফেতনা বানিয়ে রেখেছি। আমরা বারবার তাদের সাবধান করে থাকি। কিন্তু প্রতিটি সতর্ক বাণী তাদের বিদ্রোহী ভূমিকার মাত্রা বৃদ্ধি করে দেয়।" (১৭ঃ৬০)

হে নবী! আপনার পরে আপনার একদল লোক উম্মতের উপর শাসন করবে। তারা আপনার মিম্বরে উঠবে, ইসলামের কথা বলবে, বাহ্যিকভাবে ইসলাম মেনে চলবে কিন্তু বাস্তবে তারা লোকদেরকে ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে দেবে। এটা এমন একটা স্বপ্ন যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সঃ)-র নিকট কিছু নাজিল করেছেন। আমরা যদি বলি স্বপ্ন তখনই সত্য যখন কোন বস্তুগত পরিবর্তন ছাড়াই এ পার্থিব জগতে তা কার্যকর হবে, তাহলো রাসূল (সঃ)-র স্বপ্নটি অসত্য বলে বিবেচনা করতে হবে। কারণ উমাইয়ারা প্রকৃত বানর হয়ে মিম্বরে আরোহণ করেনি। বরং স্বপ্নটি একটি বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছিলো। জনগণকে মিম্বর হতে সরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে ইসলাম শুধু বাহ্যতই দেখা গেলেও তার মূল সত্ত্বা শেষ হয়ে যাবে। নবীর সামনে যখন ফেরেশতারা ছদ্মাবরণে হাজির হন, তখন তারা কোন অবাস্তব সত্ত্বা হন না বরং সত্যিকার ফেরেশতাই থাকেন। নবীদের জন্য ফেরেশতাদের সত্যাসত্য উপদেশমূলক ঘটনা যে কোন বাস্তব ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-এর বেলায়ও তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। সুতরাং এক্ষেত্রে কিতাব বহির্ভূত কোন বিষয় এখানে টেনে আনা হয়নি।

এখানে অন্য একটা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। কোন পবিত্র লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অবৈধ কোন পদ্ধতি গ্রহণকে ইসলাম যদি নিষিদ্ধই করেছে তাহলে নবী করীম (সঃ) কেন মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা থামিয়ে তাদের সম্পদাদি কেড়ে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন? এ কাজগুলোও একটা পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে করা হয়েছিল। তা হলো ইসলামের বিজয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, পবিত্র কোন লক্ষ্যের জন্যই ইসলাম জিহাদের অনুমতি দিয়েছে। একটি 'কল্যাণকর' মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে এমন সত্য কথার চেয়ে অনেক উত্তম। একটি মিথ্যা কথা বলে একজন মানুষের মূল্যবান জীবন রক্ষা ও সত্য কথা বলে তার নির্দোষ জীবনটি বিপদ সংকুল করার মধ্যে ইসলাম মিথ্যা কথাটিকেই অনুমতি দেয়। এমন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা অনুমোদিত। এটি কি পবিত্র কোন লক্ষ্যের জন্য অবৈধ বা নিন্দনীয় নয়। এ ধারণা খুবই ভুল যে জীবতাত্ত্বিক অর্থে যে কোনো ভাবেই মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে হবে।

এ ধরনের ধারণা পশ্চিমা জগত হতে আসা। জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমীর মুয়াবিয়াহ একজন মানুষ ছিলেন। তেমনি হযরত আবুযরও (রাঃ)। এমন নয় যে মুয়াবিয়ার তুলনায় আবুযরের রক্তের গ্রুপ উচ্চ মানের ছিলো। আমরা মানুষের মধ্যে তুলনা করতে গেলে তার জৈবিক গঠনের তুলনা করি না। বরং আমরা তার মানবিক গুণাবলী ও যোগ্যতাই বিবেচনা করি। একজন মানবতা বিরোধী লোক

বাস্তবিকভাবে নিজে মানুষ হতে পারে না। সীমার বিন জিলজুশন ছিল মানবতাবিরোধী অর্থাৎ মহত্ব, সততা, দয়া, ইনসাফ, ভালোবাসা, স্বাধীনতা, স্বাধীনচেতা, ধৈর্যের মতো মানবিক গুণাবলীর অভাব তাদের মধ্যে ছিল।

জৈবিক মানুষ সম্ভাবনার দিক থেকে সামাজিক (বাস্তবে নয়)। একজন মানুষ যদি মানবিকতা, স্বাধীনতা, ন্যায়-বিচার, সৎকর্মশীলতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাহলে সে আর মানুষ হিসাবে সম্মান পেতে পারে না, এবং সংরক্ষিত হতে পারে না তার সম্পদ ও জীবন। হত্যা বা প্রাণদণ্ডের মাধ্যমে জীবনের আলো হতে বঞ্চিত করা কোনক্রমে ঘৃণিত বা নিন্দনীয় নয়। তা করা হয় মহান একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। অনেক মানুষকে হত্যার জন্য দায়ী একজন খুনীকে প্রাণদণ্ড দেয়া মোটেই ঘৃণার কাজ নয়। একজন মানুষ যখন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে তখন সে নিজে আর মানুষ থাকে না। যখন আবুল আ'লা মু'য়ারী বললেন,

> "আমি বুঝি না সিকি দীনার চুরির অপরাধে ইসলামী আইন কিভাবে একটা চোরের হাত কাটার মতো শাস্তি দিতে পারে। অথবা মাত্র দশ তুমান চুরির জন্য পাঁচশো দীনার জরিমানা করে?" এর একটা সুন্দর জবাব দিয়েছেন সাইয়্যেদ মুরতাজা। "একটা হাতের মর্যাদা হলো তার সততার জন্য। বিশ্বাসঘাতক তাকে মর্যাদাচ্যুত করে। এভাবেই তুমি খোদার জ্ঞান সম্পর্কে বুঝতে পারো।"

শরীরের একটা অঙ্গ হিসেবে হাত নিজে থেকে কোন সম্মানের বস্তু নয়। তারা যদি বলে থাকেন যে এর দাম পাঁচ শত দীনার আর একটা সিকি দীনার চুরির জরিমানা বাবদ তা কেটে ফেলা হয় এর কারণ হচ্ছে হাত খুবই মর্যাদাবান, সৎ মূল্যবান। কিন্তু যদি সেই হাত বিশ্বাসঘাতক হয় তখন তো তা মূল্যহীন হয়ে যায়। (অন্ততঃ ঐ মানুষটার জন্য তার কোন মূল্য থাকে না।)

জনগণের কাছে নবী করীম (সঃ)-র দাওয়াত পৌছতে বাধা প্রদান করা ছাড়া কুরাইশ অবিশ্বাসীরা আর কিছুই করেনি। কারণ এ দাওয়াত তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তারা মুসলমানদেরকে হয়রান করেছে। নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করেছে। সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত তাদের অপরাধকে বিস্তার করেছে। তারা ছিল একদল জঘন্য সুদখোর এবং এভাবেই তারা সম্পদের বিরাট পাহাড় গড়ে তুলেছিল। এরপরও কি আমরা বলতে পারি যে তাদের সম্পদ সংরক্ষণ ও তার মর্যাদা বজায় রাখতে হবে? না, এই সম্পদ কোন মর্যাদা পেতে পারে না। এমনকি লক্ষ্য যদি পবিত্র না-ও হোত তাহলেও এ সম্পদ সম্মান ও নিরাপত্তার যোগ্য ছিল না। একটা প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা কথা দিয়ে একজন বিশ্বাসীর জীবন রক্ষা করার সমস্যার চাইতে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সত্যের প্রতি আহবান ও তার প্রচার

সত্যের প্রচার এবং তার প্রতি মানুষকে আহবান জানানোর ক্ষেত্রে কোন মিথ্যা ও অসৎ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আর আমরা তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। আর সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তোমাকে ইহ জীবনে এবং পরকালীন জীবনে দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতাম-"

(আল-কুরআন ১৭ ঃ ৭৪-৭৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন, হে নবী! এটা যদি আমাদের অনুগ্রহ না হতো, তবে তুমি ভুল করে বসতে। নবী পাকের (সঃ) ভুলটা কি ছিলো? অবিশ্বাসীরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলো, তিনি যদি চান যে তারা ইসলাম গ্রহণ করুক, তবে তিনি যেন এক বছর তাদের মূর্তিদের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন। নবী পাক (সঃ) তাদের কথামত সিদ্ধান্ত নেননি। তবে সে লোকগুলোকে সত্য পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর মনে আপোষের কোন মনোভাব হয়তো জেগে থাকতে পারে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করেন তাদের সাথে কোনরূপ আপোষ না করার। কারণ ঈমানের প্রকৃতি এরূপ আপোষ গ্রহণ করতে পারে না। এটা যদি ঈমান এবং সত্যের কোন প্রশ্ন না হতো, এবং যদি শুধুমাত্র কোন ব্যক্তির সামাজিক অধিকারের বিষয় এতে জড়িত থাকত, তবে এরূপ আপোষে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হতো না, কারণ সেক্ষেত্রে এটা পরবর্তীতে হয়তো কোন ভাল ফল বয়েও আনতে পারত।

কিন্তু মানুষকে যখন আল্লাহ্র দিকে ডাকা হয়, তখন ঈমানের ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন যদি সত্য ভিত্তিক না হয়, এবং পরে যদি তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে মানুষ আরো দূরে সরে যাবে। এটা একদিকে ইসলামের প্রতি চরম আঘাত, যার ক্ষতিপূরণ হবার নয়, আর অন্যদিকে সত্যকে পাওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণকে ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন করে না।

মরহুম হাজী মির্জা হোসেন নূরী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) হাদীসের একজন নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং প্রকৃত অভিজ্ঞ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি আশি বছর আগে ১৩২১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। আমার মরহুম পিতার (তিনি শান্তি লাভ করুন) কাছে শুনেছি, তিনি যখন শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে নাজাফে ছিলেন, তখন সেখানে তিনি হাজী নূরীকে একদিন নিচের আয়াত উল্লেখ করে ধর্মোপদেশ দান করতে দেখতে পানঃ

"এবং কোন বিষয়ে তোমরা কখনো বল না, নিশ্চয় আমি উহা আগামী কাল করবো। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে করবো এই কথা না বলে"

(আল-কুরআন ১৮ ঃ ২৩-২৪)

এর কিছু দিন পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন। তিনি মরহুম হাজী শেখ আব্বাস কোমীর ওস্তাদ ছিলেন। আমি তার লেখা একটি বই 'লুলু-ওয়া-মারজান' পড়েছি এবং এ বই আমাকে খুবই নাড়া দিয়েছে। বইটিতে ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং যারা এ সব পদ্ধতি সব সময় অনুসরণ করে না এরূপ কতিপয় প্রচারকের সমালোচনা করা হয়েছে। প্রচারকদের যেসব ভুল বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। তারা অনেক সময় সত্য প্রকাশ করে না এ যুক্তিতে যে, যদি তারা কোন দুর্বল হাদীস বর্ণনা করে যা পরে মিথ্যাও প্রতিপন্ন হতে পারে, তবু তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ তাদের মতে তাদের মূল লক্ষ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

২। তারা মনে করে যে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ইমাম হোসাইনের (আঃ) জন্য কান্নায় প্ররোচিত করা, সুতরাং সেটা পবিত্র কাজ।

বইয়ের অর্ধেক অংশ জুড়ে সত্য এবং মিথ্যার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত জোরালো প্রমাণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, ইসলাম যে কোন পরিস্থিতিতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এমনকি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও। বইটির অপর অর্ধাংশে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা সম্পর্কে এবং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর জন্য মানুষকে কান্নায় প্ররোচিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের উপায় সম্পর্কে তিনি কয়েকটি চমৎকার বিষয়ের অবতারণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একজন ভারতীয় আলেমের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি তাঁকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, যারা ধর্মের প্রচার করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলে কিংবা মিথ্যা হাদীস বলে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি যেন একখানা বই রচনা করেন। তিনি ভারতীয় আলেমকে উত্তর দেন যে, শিক্ষার খোদ কেন্দ্রেই এ ধরনের মিথ্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি জনৈক ইয়াযদী আলেমের একটি গল্প বর্ণনা করেন। একদা উক্ত আলেম মাশহাদে ইমাম রেজার (আঃ) কবর জিয়ারত করতে যাবার পথে এক মরুভূমি অতিক্রম করছিলেন। সেটা ছিলো মুহর্‌রমের মাস, এবং দিনটি ছিলো আশুরার দিন। তাই তিনি এ ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন যে হয়ত তিনি মাশহাদে কিংবা কোন বড় শহরে পৌঁছতে পারবেন না এবং ফলে ইমাম হোসাইনের (রাঃ) শোক-অনুষ্ঠানে শরীক হতে

পারবেন না। কোন পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি যে কোন গ্রামে গিয়ে শোক-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে একজন প্রচারক মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মসজিদের শ্রোতারা তাঁকে এক ব্যাগ ভর্তি পাথরের টুকরো দিলেন। প্রচারকের বক্তৃতা ও আবৃত্তিতে যখন কেহই কাঁদল না, তখন কি আশ্চর্য! বক্তা সব আলো নিভিয়ে দিলেন এবং শ্রোতাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকলেন। পাথরের আঘাতে লোকেরা তখন কান্না ও চিৎকার আরম্ভ করে দিলো। অনুষ্ঠান শেষে ইয়াযদী আলেম উক্ত প্রচারককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেন তিনি এমন কাজ করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, "এটাই একমাত্র পথ, যা দিয়ে মানুষকে ইমাম হোসাইনের (আঃ) জন্য কাঁদানো যায়। মানুষকে কাঁদানোর জন্য আমাকে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে।" ইয়াযদী আলেম তাঁকে বললেন যে তাঁর সে ধারণা ভুল এবং ইমাম হোসাইনের (আঃ) এমন অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা ও কথা আছে যা প্রকৃতই তাঁর প্রকৃত প্রেমিক ও অনুসারীদেরকে কাঁদাতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি না-ই জানে যে ইমাম হোসাইন (আঃ)-কে ছিলেন, তাহলে শত বছরের বক্তৃতায়ও তারা কাঁদবে না। মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান এবং ইসলামের বাণী প্রচার করতে গিয়ে এতটুকুও ভুল করা উচিত নয়। কারণ আল্লাহ্ তাঁর বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর রাসূলকে (সঃ) সাহায্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেনঃ

> "নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলদেরকে এবং বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করি এই দুনিয়ার জীবনে এবং সেই দিন, যেদিন সাক্ষীরা সব দণ্ডায়মান থাকবে।"
>
> (আল-কুরআন ৪০ ঃ ৫১)

অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, "হে নবী! তুমি সত্য এবং সঠিক পথ অনুসরণ করে চল, এবং আমরাই এর ফলাফল প্রদানের নিশ্চয়তা দানকারী।" নবীরা তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেকই কাজ করেন। সুতরাং ধর্ম ও ঈমানের প্রতি মানুষকে আহবান জানাতে গিয়ে আমরা বাছবিচার না করে যে কোন পন্থা অবলম্বন করব-এ অনুমতি আমাদেরকে দেয়া হয়নি। এরূপ করলে বরং বিপরীত ফলই বয়ে আনতে পারে।

সঠিক উৎসের সম্পদে যারা সমৃদ্ধ নয়, তাদেরই মিথ্যা রচনা করার দরকার পড়ে। সত্য উৎসের সম্পদে আমরা এত সমৃদ্ধ যে মিথ্যা রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাই একটা অপরাধ। আমরা যদি ইমাম হোসাইনের (আঃ) জন্য লোকদেরকে কাঁদাতে চাই, তবে আশুরার ঘটনা এত বেশী বীরত্বব্যঞ্জক, আবেগময়ী, করুণ, আকর্ষণীয়, উন্নত ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যে ভরপুর যে এ সত্যের প্রেক্ষাপটে ইমাম হোসাইনের (আঃ) উল্লেখ মাত্রই মানুষকে কাঁদাবার জন্য যথেষ্ট।

তবে শর্ত এই যে তাদের অন্তরে ঈমানের স্ফুলিঙ্গ থাকতে হবে। বলা হয় যে প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে ইমাম হোসানইনের (আঃ) জন্য ভালবাসা নিহিত থাকে ঃ "আমার শাহাদাত অশ্রুর সহযোগী।"৩

মরহুম মোহাদ্দিস কোমী তাঁর 'নাফসাতুল মাসদূর' গ্রন্থে আবু হারূনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবু হারূন একজন অন্ধ কিন্তু শক্তিমান কবি ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ইমাম হোসাইনের (আঃ) উপর শোক-গাথা রচনা করতেন। তিনি ইমাম সাদিকের (আঃ) সহচর ছিলেন। একবার তিনি ইমাম সাদিকের (আঃ) সাথে দেখা করতে গেলে ইমাম সাহেব তাঁর প্রপিতামহ ইমাম হোসাইনের (আঃ) উপর একটি শোক-গাথা আবৃত্তি করার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন। আবু হারূন আবৃত্তি করতে উদ্যত হলে ইমাম বাড়ীর মহিলাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে তাঁর শোক-গাথা শোনার জন্য বলেন। আবু হারূন তাঁর একটি সাম্প্রতিকতম শোক-গাথা আবৃত্তি করা আরম্ভ করেন। তিনি মাত্র পাঁচটি শ্লোক আবৃত্তি করেছেন, তখনই বাড়ীর ভেতরে চীৎকার এবং শোরগোল পড়ে যায়, এবং ইমাম সাদিক (আঃ) কাঁদতে আরম্ভ করেন। তাঁর স্কন্ধদেশ কাঁপতে থাকে। কান্নার গভীরতা ক্রমান্বয়ে আরো বেশী হতে থাকলে ইমাম সাদিক (আঃ) আবু হারূনকে তাঁর আবৃত্তি থামাতে বলেন। আমি যত শোক-গাথা শুনেছি, তার মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি কোম যাবার পূর্বে যখন মাসহাদে একজন ছাত্র ছিলাম, তখনই এটা আমি 'নাফ্সাতুল মাসদূর' থেকে মুখস্ত করে নিই। এটা নিম্নরূপঃ

"ওগো পথিক! ওগো পশ্চিমা বাতাস!
তুমি আলীর পুত্র হোসাইনের কবরের পাশ দিয়ে বয়ে যাও,
এবং তাঁকে তাঁর বন্ধুদের ও অনুসারীদের খবর পৌঁছে দাও।
ওগো বাতাস! ইমাম হোসাইনের পবিত্র অস্থি-র কাছে
তুমি আমাদের খবর নিয়ে যাও, এবং তাঁকে বল ঃ ওগো অস্থি!
তুমি হোসাইনের বন্ধুদের চোখের পানিতে সর্বদাই আজ পরিতৃপ্ত।
যদিও তারা তোমাকে পানি থেকে বঞ্চিত করেছিল,
যদিও তারা ইমাম হোসাইনকে চরম পিপাসার মধ্যে
শহীদ করেছিল আজ ইমাম হোসাইনের বন্ধুরা সব সময় তাদের
চোখের পানিতে তোমাকে পরিতৃপ্ত করে রাখছে।
ওগো বাতাস! যদি তুমি সে সমস্ত মাসুম লোকদের

৩। বিহার-উল আনোয়ার, নতুন সংস্করণ, ৪৪ খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮০।

মৃতদেহের পাশ দিয়ে বয়ে যাও,
তবে শুধু সালাম জানিয়েই ক্ষান্ত হয়ো না,
বরং তাদের পাশে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান কর।
ইমাম হোসাইনের কষ্টের কথা স্মরণ করে
একজন পুত্র-হারা মায়ের মত অশ্রু ফেলিও,
যে মা তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছে।
সে যেমন তার মাসুম পুত্রের জন্য কাঁদে
তুমিও সেরূপ মাসুম পিতা মাতার সন্তান
ইমাম হোসাইনের জন্য কাঁদিও"

নাফ্‌সাতুল মাসদূর, পৃঃ ৪৬

সত্যের বাণী কিভাবে প্রচার করতে হয়

মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী কিভাবে প্রচার করতে হয় নবী করীম (সঃ) তা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্‌র জন্য প্রচার এবং অন্যান্য প্রচারের মধ্যে যারা কোন পার্থক্য দেখতে পায় না, তাদের কাছে একটা গুরুত্বহীন মনে হতে পারে। কুরআনে এই ধরনের প্রচারের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এর সাথে যে অসুবিধা জড়িত হতে পারে, আমরা প্রথমে তা পরীক্ষা করে দেখবো। অতঃপর এ দু'ধরনের প্রচারে মধ্যে যে তফাৎ তার ব্যাখ্যা করবো।

এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বাহায় ইমরান পুত্র মুসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বাহ্যতঃ হযরত মুসার (আঃ) ঘটনা ছিল একটি ভিন্ন ব্যাপার। তিনি মিশর প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করেন। তাঁর মিশর যাবার পথে তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। তিনি আগুন জ্বালাতে চাইলেন যা তাঁর স্ত্রীর শরীরকে গরম করতে পারে। হঠাৎ তিনি পাহাড়ের উপর আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করেন এবং তথায় গিয়ে তা নিয়ে আসার জন্য অগ্রসর হন। সেখানে তিনি প্রথমবারের মত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এ প্রত্যাদেশের মূল কথা ছিল ফেরাউন এবং তার লোকদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দেয়ার আদেশ। তখন থেকে হযরত মুসা (আঃ) খোদার রাসূল নিযুক্ত হলেন এবং তিনি আর কোন সাধারণ মানুষ নন। যখন তিনি জানলেন যে তাঁকে খোদার বাণী ফেরাউনের কাছে নিয়ে যেতে হবে, তখন তিনি এ দায়িত্বের গুরুভার বুঝতে পারেন এবং এ জন্য খোদার নিকট কয়েকটি জিনিসের জন্য প্রার্থনা করেনঃ

"হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও
এবং আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও।
আমার জিহবার জড়তা দূর করে দাও
যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে আমার ভাই হারুনকে
আমার জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দাও
তাঁর দ্বারা আমার পৃষ্ঠকে শক্তিশালী করে দাও।
তাঁকে আমার কাজের অংশীদারী করে দাও
যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা
ঘোষণা করতে পারি
এবং তোমাকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করতে পারি।"

আল-কুরআন (২০ ঃ ২৫-৩৪)।

অনেকে বিশ্বাস করে থাকেন যে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর জিহবার জড়তা দূর করে দেবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ তাঁর জিহবার তোতলামী ছিলো এবং কথা ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতেন না। অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন যে যখন হযরত মুসা (আঃ) শিশু ছিলেন তখন ফেরাউন তাঁকে পরীক্ষা করতে চান এবং এ পরীক্ষার সময় মুসা (আঃ) একটি জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁর মুখের ভিতরে জিহবায় দিয়ে দেন, ফলে তাঁর তোতলামীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু না। এ সমস্ত কারণে তিনি খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেননি। কুরআন পাক অনুসারে, এর কারণ হচ্ছে যে, নবীর বাণীকে অবশ্যই সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য হতে হবে, আর তা হবে পথ প্রদর্শনকারী আলো। আমার ভাইকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও এ জন্য যে এর দ্বারা আমাদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

কুরআনের অন্যত্র, সূরা আলাম-নাশরায় আল্লাহ্‌ পাক নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে সম্বোধন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেনঃ

"আমরা কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দেই নাই!
এবং তোমার উপর হতে কি তোমার দুর্বহ বোঝা নামিয়ে
দেই নাই যাহা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল,
আর তোমারই জন্য তোমার প্রশংসাকে আমরা উচ্চে তুলে
দিয়েছি। অতএব প্রকৃত কথা এই যে, নিশ্চয়ই

কঠিনতার সঙ্গেই সহজতা রয়েছে;
আবার শোন! নিশ্চয় কঠিনতার সঙ্গেই সহজতা রয়েছে;
অতএব, যখনই তুমি অবসর পাবে
তখনই ইবাদত-বন্দেগীতে আত্ম-নিয়োগ করবে
এবং তোমার খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে
গভীর মনোনিবেশ দান করবে।"

আল-কুরআন

হযরত মুসা (আঃ) তাঁর বক্ষ প্রশস্ত করে দেবার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ পাক না চাইতেই মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর এ অনুগ্রহ দান করেছেন। এর অর্থ এই যে দ্বীন প্রচারের স্বর্গীয় দায়িত্ব একটি গুরু দায়িত্ব এবং এ কাজের জন্য বড় যোগ্যতার প্রয়োজন। তাই আল্লাহ বলছেন আমরা তোমাকে সে যোগ্যতা দান করেছি এবং তোমাকে বোঝামুক্ত করেছি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, হযরত মুসা (আঃ) খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর বোঝা সহজ করে দেবার জন্য, এবং মুহাম্মদ (সঃ)কে বলা হচ্ছে যে তাঁর বোঝা আগেই হালকা করে দেয়া হয়েছে, যা তার পৃষ্ঠ ভেঙ্গে দিতো।

মহানবী (সঃ) দু'বার এ আয়াত শুনে মনে খুবই সান্ত্বনা লাভ করেছিলেনঃ "আবার বলছি শোন! কাঠিন্যের সঙ্গেই রয়েছে সহজতা।" এর দ্বারা তিনি বুঝে নেন যে প্রত্যেক কাঠিন্যের জন্য তাঁকে দু'টি সহজতা দান করা হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় প্রত্যেক কঠিন অবস্থায় মোকাবেলায় দু'টি সহজতা দান কি জিনিস? তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে প্রত্যেক কঠিন অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে আরো অধিক প্রশান্তি দান করবেন।

আমরা এ আয়াতটিকে হযরত মুসা (আঃ)-র ঘটনার সাথে তুলনা করে দেখবো এবং তার আলোকে মুসলমানদের শিয়া-সুন্নী উভয় গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত প্রাসঙ্গিক নীচের হাদীস বিবেচনা করে দেখবো। মহানবী (সঃ) বলেন ঃ

"হে আলী! আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মুসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মত।"[৪] এর অর্থ এই যে হারুন যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন, তেমনই হযরত আলী (আঃ) মহানবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী(যদিও অনেক লোক হারুনকে পরিত্যাগ করে শামিরিকে অনুসরণ করেছিল)।

কুরআনের অন্যত্র সূরা আল-মুজ্জাম্মেলের একটি আয়াতে খোদার বাণী

৪। সফিনাতুল বিহার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৩-৮৪

প্রচারের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে। সূরা মুজ্জাম্মেল এবং সূরা মুদ্দাসির মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবী হিসাবে নিয়োগ লাভের প্রথম দিকের অবতীর্ণ সূরা। নবী (সঃ)কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

"আমরা তোমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ কালামের দায়িত্ব দান করব। এটি আর কিছুই নয়, বরং মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান করা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা।" (আল-কুরআন, ৭৩ ঃ ৫)

বিষয়বস্তু ও পরিপ্রেক্ষিতসহ এ "গুরুত্বপূর্ণ কালাম"-এর অর্থ বুঝা কষ্টকর। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো আমরা ঠিকভাবেই বুঝি এবং তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করি। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মীয় নির্দেশ হিসেবে কোনো আইন জারী করা। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে ৯৫% লোক আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্বের সাথে পরিচিত, এবং ধর্মীয় নির্দেশ জারীর সাথে যে অসুবিধা জড়িত তারা তা উপলব্ধি করে। এ জন্য ইজতিহাদের এরূপ পর্যায় দাবী করার সাহস করে না। অন্যদিকে যদি অযোগ্য ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা যোগ্য আইন বিশারদ হওয়ার দাবী করে তবে লোকেরা তাদেরকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু মানুষেরা আইনের তুলনায় দ্বীন প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে নাঃ

এ পথে নবীদের উপমা উষ্ট্র চালকের মতো
মানুষের কাফেলাকে তাঁরা লক্ষ্যে করেন পরিচালিত
তাঁদের সবার মাঝে আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী,
তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ, চরম লক্ষ্যে যিনি হয়েছেন উপনীত
পুনর্মিলনের আলো, তাঁর চেহারা, জীবন রক্ষাকারী
এবং পরিপূর্ণ সত্ত্বার অবয়ব তাঁর, তাঁর কমনীয় স্থান।
সম্মুখে চলেন তিনি, সকল হৃদয় করে তাঁর অনুসরণ
তিনি তৈরী করে দেন তাঁকে অনুসরণের পথ "মানুষের অন্তর।"

বিষয়টি হচ্ছে কর্মের এবং গতিশীলতার। অনেক মতবাদ আছে যেগুলো মানুষকে কর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সেটা অত্যন্ত ভাল কথা। কিন্তু পরিচালিত করে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ ও অধিকারের প্রতি। নবীরাও মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন, কিন্তু তাঁদের কাছে এরূপ উদ্বুদ্ধকরণ কম গুরুত্ব বহন করে, কারণ মানুষের বস্তুবাদী প্রবণতা ও আগ্রহও মানুষকে এদিকেই পরিচালিত করে। তারা শ্লোগান তোলে "হে শ্রমিকবৃন্দ, তোমরা এক হও এবং অত্যাচারীদের কাছ থেকে তোমাদের অধিকার ছিনিয়ে আন।" এ ধরনের

উত্তেজনা সৃষ্টি নবীদের কাছে খুবই ছোট ব্যাপার, কারণ তাঁরা এ কাজ সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ পন্থায় করে থাকেন। মানুষের যে বিরাট কর্ম দক্ষতা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা, তা আসে তার ভেতর থেকে, এবং তা মানুষের গভীর অন্তরের সত্ত্বা থেকে তাকে সত্য ও বাস্তবতা উদঘাটনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কবি হাফিজ বলেনঃ

"এসো হে সাকী, স্বর্গ-সুধার চির পরিবেশনাকারী,
কেননা, বিলম্ব হবে দুঃখজনক, আনবে শুধু ক্ষতি!
স্বার্থহীনতা প্রেমের চাবি, যে প্রেম জাগে ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিপাতে,
সীমার ভিতর বদ্ধ সে নহে, করে দূরত্ব অতিক্রম।"

মানুষকে তার আভ্যন্তরীণ নীচতা থেকে মুক্ত করে,তার সত্ত্বাকে উন্নত মহীয়ান করা এবং তাকে সত্য পথে পরিচালিত করাই ছিলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দ্বীন প্রচারের অর্থ হচ্ছে মানুষকে তার ভেতর থেকে তার অহম এর বিরুদ্ধে জাগ্রত করা। এ ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শুধু অত্যাচারিতকে জাগ্রত করে না, বরং অত্যাচারীকে তার নিজের বিরুদ্ধেও জাগ্রত করে। এটাকেই আমরা বলি মানুষের তার সঠিক সত্ত্বায় ফিরে যাওয়া, অর্থাৎ অনুশোচনা বা তওবা।

মানুষকে তার নিজের অহং এবং স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে জাগ্রত করে সত্য পথে পরিচালিত করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। এবং যদি কোন ব্যক্তি এ কাজে নবীদের মত যোগ্যতা দেখাতে পারে, তবে সে ব্যক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ও যোগ্য ব্যক্তি। অনেক ব্যক্তিই এ পথে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, এবং আল্লাহ্‌র পথে আহবানকারীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতা সহ্য করেছেন। একটি প্রবাদ আছেঃ "মানুষ বোতলের মধ্যে স্পষ্ট তিলের তৈল দেখতে পায়, কিন্তু তারা জানে না বেচারা তিলকে কতো প্রক্রিয়ায় কতো চাপ সহ্য করতে হয়েছে।"

মানুষ প্রচারকদের কাজের ফল দেখতে পায়। কিন্তু তারা জানে না যে এ কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। পবিত্র কুরআন বিষয়টি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে একে মানুষের নিকট শিক্ষণীয় বিষয় রূপে উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ্‌ এবং তাঁর প্রিয় নবীর মধ্যে যা কিছু ঘটেছে, তার বেশীর ভাগই তাঁদের পর্যায়েই রয়ে গেছে, কিন্তু দ্বীন প্রচার এবং মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করার বিষয়টি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর নিকট উল্লেখ করেছেন এবং নবীও তা বার বার বর্ণনা করে মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে খোদার পথে আহবানের এবং খোদার বাণী প্রচারের সঠিক পদ্ধতি নবীদের কাছে থেকে মানুষের শিক্ষা করা দরকার।

দাওয়াত এবং প্রচার একটি কঠিন কাজ ঃ তার জন্যে কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্ত

প্রচার এবং আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন থেকে প্রথম যে জিনিসটি আমরা শিখতে পারি, তা হচ্ছে, মানুষের অন্তরের প্রশস্ততার প্রশ্ন, অর্থাৎ একজনের অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে কতটুকু স্থান দিতে পারে। অবশ্য সব ধরনের প্রচার এটির মত কঠিন নয়। যেমন কখনো কখনো প্রচারের বাণী প্রকাশ্য মাধ্যমের দ্বারা সহজে বুঝা যায়, যেমন আদালতের পরওয়ানা দ্বারা অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত করা হয় এবং তাকে আদালতে ডাকা হয়। এ ধরনের প্রচার কোন কঠিন কাজ নয়।

কখনো কখনো প্রকাশ্য উপায়ের মাধ্যমে শুধু খবর পৌঁছানো যথেষ্ট হয় না; বরং এর অতিরিক্ত, খবরটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করে শ্রোতার মনকেও প্রভাবিত করতে হয়। দর্শন এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কাছে যা উপস্থাপন করা হয় তা যে বুদ্ধির কাছে গৃহীত হবেই এমন না-ও হতে পারে। কোন বাণী বা দাওয়াতকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের নিকট যা গ্রহণযোগ্য করে তোলে, তা উক্ত বাণীর কথাসমূহের শুধু শব্দ বা লিখিত প্রতীক নয়, বরং তার অতিরিক্ত কিছু জিনিস যার নাম বিবেক বা যুক্তি। নবীরা প্রথমতঃ বুদ্ধি বা জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের বাণীর প্রচার করতে চেয়েছেন। যদি খৃষ্টানরা আজ এ নীতি পরিত্যাগ করে থাকে, এবং যদি তারা বলে যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের ব্যাপারে বুদ্ধিবিবেকের কোন গুরুত্ব নেই, তবে এ কথা তারা শুধু এ জন্যেই বলতে পারে যে তারা খৃষ্ট ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে। হযরত ঈসা (আঃ) এমন কথা কখনো বলেননি। তিনি ত্রিত্ববাদের কথাও বলেননি, ঈমান ও জ্ঞানবুদ্ধির সম্পর্কহীনতার কথাও বলেননি। পবিত্র কুরআন বলেঃ

> "তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথে আহবান করো বিজ্ঞতা ও সদুপদেশ দিয়ে এবং তাহাদের সাথে আলোচনা করো উত্তম পদ্ধতিতে।" (১৬ ঃ ১২৫)

কুরআনই প্রথমে বুদ্ধিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেঃ

> "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী রূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। তুমি সুসংবাদ প্রদান করো বিশ্বাসীদেরকে যে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৭)

একজন সতর্ককারী যিনি, শুধু মানুষকে ভয় প্রদর্শনই করেন এমন নয়, বরং তিনি মানুষকে প্রয়োজনে জরুরী পরিস্থিতি সম্পর্কেও ঘোষণা দেন, এবং সম্মুখে কোন বিপদ থাকলে তাও অবহিত করেন।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর নবুওয়তের প্রথম দিকে সাফা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মানুষকে আহবান করে সতর্ক করেন। তাঁর আহবানে মানুষেরা একত্রিত হয়ে বিস্মিত হয়ে যায় যে কিসের জন্যে তিনি তাদেরকে ডেকেছেন? প্রথমে নবী পাক (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করে কিনা? যখন তারা সকলে ঘোষণা করলো যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করে; তখন তিনি বললেন, তিনি তাদেরকে সতর্ক করতে চান যে এ পর্বতের পেছনে এক শত্রু বাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করার জন্যে লুকিয়ে আছে। এ কথা বলে তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখনো কি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে। তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা তারা আবারো জোর দিয়ে ঘোষণা করলো। এবার তিনি বললেন, "এখন আমি তোমাদেরকে সতর্ক দিতে চাই যে, তোমরা এখন যা করছো, তা তোমাদেরকে খোদার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইহকালীন এবং পরকালীন কঠিন শাস্তির দিকে পরিচালিত করছে।" নবীরা এভাবেই মানুষকে খোদার পথে আহবান করার জন্যে দায়িত্ব পান।

মানুষকে খোদার দিকে আহবানের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন মানুষকে বিশ্বের মহাসত্য ও আল্লাহ্‌র পথে আহবানের পন্থা এবং মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান জাগ্রত করার উপায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। খোদার বাণী শুধু পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট নয়। নবীরা যে কর্ম করেন এবং যে আহবান জানান, তা দ্বীন প্রচারের পূর্ববর্তী একটি পদক্ষেপ। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞান পৌঁছে দেয়া। তিনি ব্লাক বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের জন্যে সমস্যাবলীর সমাধান বের করে দেন। অন্যদিকে ছাত্ররা শিক্ষকের বক্তব্য পুরোপুরি বুঝে নেবার জন্যে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন। শিক্ষক যখন তাঁর প্রশ্নাবলীর উত্তর এবং বক্তব্যের প্রমাণ উপস্থিত করেন, তাঁর শিক্ষা দান ছাত্রদের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি করে।

দার্শনিকরাও শিক্ষকদের মতো। তারা বেশী যা করেন তা হচ্ছে কোন একটি ধারণার সপক্ষে মানুষের মনকে প্রভাবিত করা। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে মানুষের মনকে শুধু প্রভাবিত করাই যথেষ্ট নয়। সে বাণী মানুষের হৃদয়ে, তার আত্মার গভীরে পৌঁছাতে হবে, যাতে তা তার সমস্ত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নবীরা এ কাজটাই করতেন, এবং তাঁরা ছিলেন সেই সব ব্যক্তি যাঁরা মানব জাতিকে সত্য এবং খোদার সঠিক পথে পরিচালিত করেন, দার্শনিকরা এ কাজ করতে পারেন না। একজন দার্শনিক যত বেশী চেষ্টাই করুন না কেন তিনি

মানুষের মনকে কেবল মাত্র একটি ধারণা বা তত্ত্ব সম্পর্কে প্রভাবিত করতে পারেন। এটিও পারেন শুধু নির্দিষ্ট কিছু লোকের ক্ষেত্রে, যারা বছরের পর বছর ধরে তার ছাত্র থাকে। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁকে বিশেষ বিশেষ পরিভাষা এবং শত শত বাকধারা ও বিশেষ শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করতে হয়। আমার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বলেন, দার্শনিকরা যে এত বেশী ধরনের শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করেন, যেমন আবশ্যকীয় সম্ভাব্যতা, ভবিষ্যত সম্ভাব্যতা, ঝোঁক-প্রবণতার সম্ভাব্যতা, প্রাথমিক বুদ্ধিজ্ঞান, দ্বিতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজ্ঞান ইত্যাদি। তার একমাত্র কারণ, তারা নিজেদেরকে সরলভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। অন্যদিকে নবীদের এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা সহজ সরল কথায় নিজেদেরকে প্রকাশ করেন।

দর্শন শাস্ত্রের বিভ্রান্তিমূলক বহু বাকবিধি ব্যবহার করে দার্শনিকরা যে কথা বলতে চান, নবীরা মাত্র দু'টি সরল ছোট বাক্যের দ্বারাই সে কথা বলতে পারেন, যা অতি সহজেই বোধগম্য; এত সরল ও বোধগম্য যে দার্শনিকরা অবাক হয়ে যান। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লক্ষ্য করুনঃ

"বল! তিনি আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়,
আল্লাহ্ সমস্ত অভাব থেকে মুক্ত,
তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই, কারো জাতও নহেন,
এবং তাঁর তুল্য আর কেহই নেই" আল-কুরআন (তাওহীদ ঃ ১১২)।

"আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে
সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
আকাশ মণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই;
তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটনা;
তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।
তিনিই আদি, তিনিই অন্ত,
তিনি যুগপৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত, এবং
তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।
তিনিই ছয় দিবসে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।

তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে
ও যা কিছু ভূমি হতে নির্গত হয়, এবং
আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও
আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়।
তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের
সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর
আল্লাহ্ তা সবই দেখেন।"

(আল-কুরআনঃ ৫৭ ঃ ১-৪)

এ আয়াতগুলোতে খুব সহজ কথায় ঐক্যের প্রকাশ ঘটেছে। নবীর প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে প্রাণে তাঁর অনুগত হয়ে যায়। যুগ শ্রেষ্ঠ মনীষী ইবনে সীনা সম্পর্কে একটি বিখ্যাত গল্প আছে। তাঁর ছিলো উজ্জ্বল চক্ষু এবং সুতীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি। সুতরাং মানুষ তাঁর সম্পর্কে নানা প্রকার গল্প সৃষ্টি করতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা বলত যে তিনি ইস্ফাহানে থেকে কাশানের কর্মকারের হাতুড়ির শব্দ শুনতে পারেন। বাহ্মানিয়ার নামে তাঁর একজন ছাত্র একদা তাঁকে বলে, "আপনি এমন একজন ব্যক্তি যে আপনি দাবী করলে মানুষেরা আপনাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করবে।" ইবনে সীনা বললেন যে, এসব অর্থহীন বাজে কথা। কিন্তু বাহ্মানিয়ার তার কথায় জিদ ধরে থাকল। ইবনে সীনা তাকে বাস্তব উত্তর দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। একবার শীতকালে তাঁরা দু'জন একসাথে সফরে ছিলেন, এবং সেদিন খুব তুষার পড়ছিল। ফজরের সময় মুয়াজ্জিন নামাজের জন্যে আযান দিচ্ছিলেন। ইবনে সীনা বাহ্মানিয়ারকে জাগিয়ে তাকে এক গ্লাস খাবার পানি আনতে বললেন। বাহ্মানিয়ার যুক্তি প্রদর্শন করে বলল, "উস্তাদজী! আপনি একজন চিকিৎসক, এবং আপনি ভালভাবেই জানেন যে শূন্য ও ক্ষুধার্ত পেটে ঠাণ্ডা পানি পান করলে তা পাকস্থলীকে তোলপাড় করে তুলবে।" ইবনে সীনা বললেন, "আমি একজন চিকিৎসক, এবং তুমি আমার ছাত্র। আমি তোমাকে বলছি যে আমি তৃষ্ণার্ত, তবে কেন তুমি যেতে ইতস্ততঃ করছ?" বাহ্মানিয়ার এবারও যুক্তি দেখিয়ে বলল, "হাঁ, আপনি আমার শিক্ষক, কিন্তু আমি আপনার কথা শ্রবণ ও পালনের পরিবর্তে শুধু আপনার কল্যাণই চেয়েছি।" কিন্তু প্রকৃত কারণ, বাহ্মানিয়ারের পক্ষে শীতের মধ্যে উঠে গিয়ে পানি আনা কষ্টকর ছিল-এ কথা প্রমাণ করার পর ইবনে সীনা বললেন, "আমি মোটেই তৃষ্ণার্ত নই। আমি শুধু তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তোমার কি মনে আছে যে তুমি আমাকে

নবুওয়ত দাবী করতে বলেছিলে? এটাই হচ্ছে তোমার সে প্রশ্নের উত্তর। তুমি অনেক বছর যাবত আমার ছাত্র রয়েছো, তবু যখন আমি তোমাকে উঠে গিয়ে কিছু পানি আনতে বললাম, তুমি তখন উঠতে ইতস্ততঃ করে আমার সাথে যুক্তিতর্ক শুরু করে দিলে। অথচ ঐ মুয়াজ্জিনকে তুমি দেখো যে মহানবীর (সাঃ) মৃত্যুর হাজার বছর পরেও তাঁর প্রতি অনুগত থেকে এত সকালে ঘুম থেকে জেগে আরামের গরম বিছানা ছেড়ে মিনারে উঠে ঘোষণা করছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র রাসূল। অতএব নবী হচ্ছেন তিনি, আমি ইবনে সীনা নই।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে খোদার পক্ষ থেকে যদি কোন বাণী মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে হয়, তবে সে বাণীকে অবশ্যই এমন হতে হয় যা মানুষের হৃদয়কে আনুগত্যের বন্ধনে আকর্ষণ করে, এবং সমাজকে কর্মে উদ্দীপিত করে। এতে শুধু তাদের অধিকারই অর্জিত হয় না, বরং যখন তারা কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করে তখন তাদের হৃদয় অনুশোচনায় অশ্রু বর্ষিত হয়ঃ

"এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটি তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" (আল কুরআন ১৭ ঃ ১০৯)

এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। পবিত্র কুরআনে প্রচারের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক আয়াত এসেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পূর্ববর্তী নবীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেও এমন অনেক আয়াত এসেছে যাতে খোদার বাণী পৌঁছানোর জন্যে এবং হৃদয় আকর্ষণ করার মত সঠিক প্রচার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

কিছু কিছু শব্দ ও পরিভাষা খারাপ অর্থ বহন করে, আবার অন্য কিছু শব্দ ও পরিভাষা ভাল ফল প্রদানের ইঙ্গিত বহন করে। 'প্রচার' শব্দটি আধুনিক যুগের শিক্ষিত লোকেরা যেভাবে ব্যবহার করে, তাতে এর দ্বারা খারাপ অর্থই প্রকাশ পায়। যেমন প্রতারণা বা প্রলুব্ধকরণ। খারাপ অর্থে 'প্রচার' শব্দের এরূপ ব্যবহারের ফল এ হতে পারে না যে আমরা এর ব্যবহার ছেড়ে দিব। আমরা এ শব্দটি ব্যবহার করি এবং করব, কারণ পবিত্র কুরআনে এটি বেশ কয়েক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছেঃ ১৬ঃ৩৫, ২১ঃ১৮, ২৪ঃ৫৪। কেবলমাত্র তিনিই প্রচারক, যিনি তার বক্তব্যকে সত্য এবং শক্তিশালী অথচ সরল ও বুদ্ধিদীপ্ত শব্দের মাধ্যমে প্রচার করেন, তিনিই মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবানের কাজে সফলকাম হন। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আলীর (আঃ) ধর্মীয় বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা যায়, যা বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এগুলো এখনো সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য এবং শ্রোতারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে এখনো এর দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে।

পবিত্র কুরআনে মানুষের নিকট প্রচার এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করা বুঝানোর জন্যে একটি শব্দ 'নসহ্' (ট্রেদ) "স্পষ্ট বা সরল উপদেশ" বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'গাস', (ঐদট্রদ) প্রতারণা বা অসৎ উপদেশ। যে কোন জিনিস যা কৃত্রিম বা নকল, তা সৎ বা সরল নয়। সুতরাং কেবল মাত্র যাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে এবং সত্য কথা বলে, তারাই মানুষকে খোদার পথে ডাকতে পারে; অর্থাৎ তাদের আকাঙ্খা মানুষের কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

"যে কথা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, কেবল সে কথাই হৃদয়কে প্রভাবিত করতে পারে; আর যে কথা শুধু জিহ্বা থেকে বের হয়, তা কেবল কান পর্যন্তই পৌঁছে, এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।"

নবী পাক (সাঃ) -এর সমস্ত কথাই হৃদয় স্পর্শকারী সদুপদেশ। পবিত্র কুরআন বলেঃ

১। "আমি তোমাদেরকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দেই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই; এবং আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এমন সব বিষয় জানি, যা তোমরা জান না।" (৭ ঃ ৬২)

২। "আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না। যদি আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"
(১১ ঃ ৩৪)

৩। "আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের বিশ্বস্ত উপদেশ দানকারী।" (৭ ঃ ৬৮)

৪। "সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী।" (৭ ঃ ২১)।

৫। "আমি তোমাদের নিকট আমার প্রভুর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি, এবং তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেছি, কিন্তু তোমরা সদুপদেশ দানকারীদিগকে ভালোবাস না।" (৭ ঃ ৭৯)

৬। "অতঃপর তিনি তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি আমার প্রভুর পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেছি।" (৭ ঃ ৩৯)

ইমরান পুত্র হযরত মুসা (আঃ) যখন খোদার সাথে কথা বলেন, তখন তিনি বলেন যে, তিনি যে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তার কঠিন দিক এটা নয় যে তাঁকে স্বৈরাচারী ফেরাউনের সকল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, বরং এর

কাঠিন্য অন্যত্র। তারপর তিনি খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন যাতে তিনি এমন মুসা হতে পারেন, যে মুসা তার ব্যক্তি সত্ত্বা, স্বার্থপরতা এবং অহংবোধকে বিসর্জন দিতে পারেন, যাতে তিনি পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে খোদার বাণী প্রচার করতে পারেন।

নবীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা নিজেদের উপর কোন কষ্ট বা অসুবিধা আরোপ করা বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। পবিত্র কুরআনে সূরা সোয়াদে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

"(হে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনি মানুষকে) বলুন, 'আমি আমার উপদেশের (নবুয়তীর দায়িত্ব বা কাজ) বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(কুরআন ৩৮ ঃ ৮৬)

নিজের উপর কষ্ট আরোপ করার অর্থ, কোন কষ্ট ও অসুবিধা গ্রহণ করা অথবা লৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা। অনেক সময় কোন ব্যক্তি অন্যের উপর এমন ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে যার প্রতি তার নিজেরই হয়ত কোন বিশ্বাস নাই। এটা করা খুবই কঠিন কাজঃ

"জীবনের পরিমণ্ডলে" যা নহে কোনো অংশীদার

কেমন করে তা জীবন-দায়ী উৎস হতে পারে?

এবং যে মেঘ অতি পুরাতন, শুষ্ক ও পরিশ্রুত,

কেমন করে তা বদান্যতার বৃষ্টি দিতে পারে।"

নিজের উপর কষ্ট আরোপ করার এটি একটি অর্থ। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে- যা ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরো অনেকে উল্লেখ করেছেন, কোন জ্ঞান ব্যতিরেকেই কথা বলা। পৃথিবীতে নবী এবং ইমাম ছাড়া আর কেউ এমন নেই যে অন্যের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার মত সবকিছুর জ্ঞান রাখে। একবার এক ইহুদী জিজ্ঞাসা করলো, "এমন কে আছে যে পরম জ্ঞানের দাবী করতে পারে?" হযরত আলী (আঃ) উত্তর দেন, "নবী পাক (সাঃ) অবশ্যই সে দাবী করতে পারেন।" তিনি ইহুদীকে আরো বলেন, "আমাকে হারানোর পূর্বেই তুমি আমাকে তোমার প্রশ্ন করতে পার।" এ ছাড়া তুমি আর কাউকেই আশা করতে পার না-যে প্রত্যেক জিনিসই জানে। আর প্রত্যেকের উচিত নিজেকে খুব ভালোভাবে জানা এবং যে সম্পর্কে সে জানে না সে সম্পর্কে তার কিছু বলা উচিত নয়। ইবনে মাসউদ বলেছেন,

"তুমি যা জানো তাই কেবল বলো, এবং যা তুমি জানো না তা বলো না। যদি তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হয় যার উত্তর তুমি জানো না, তবে সাহসের সঙ্গে তা বলো (যে তুমি এ ব্যাপারে জানো না)।"

অতঃপর তিনি এ আয়াতের উল্লেখ করেনঃ

"হে মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি মানুষকে বলুন, 'আমি আমার উপদেশের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি দাবীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই (আমি কষ্ট আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই)।" (আল কুরআন ৩৮ ঃ ৮৬)।

ইবনে জওযি, যিনি তাঁর সময়ের বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন, একবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক মহিলা তাঁকে এমন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন, যা তিনি জানতেন না। মহিলা বললেন, "আপনি যদি এ প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তবে কেন আপনি মঞ্চের তিনটি ধাপ উপরে উঠেছেন?" ইবনে জওযি উত্তর দিলেন, "আমি যে অন্যদের চেয়ে তিন ধাপ উপরে বক্তৃতা-মঞ্চে উঠেছি এর কারণ আমি কিছু জানি যা তোমরা জান না। যদি আমি আমার অজ্ঞতার পরিমাণে মঞ্চে উঠতে চাইতাম, তবে আমার জন্যে এমন একটি মঞ্চের প্রয়োজন হত, যা আকাশে গিয়ে পৌছাত!"

মরহুম শাইখ আনসারি (তাঁর উপর শান্তি হোক) তাঁর সময়ের একজন প্রতিভাবান মনীষী ছিলেন এবং এখনও বিদ্বানেরা তাঁর সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিতে গর্ব বোধ করেন। যখনই তাঁকে এমন কোন প্রশ্ন করা হতো যার উত্তর তিনি জানতেন না, তখনই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চস্বরে বার বার বলতেন, "আমি জানি না। আমি জানি না!" এটা তিনি করতেন তার ছাত্রদেরকে এ শিক্ষা দেবার জন্যে যে তারা যে কোন বিষয় জানবে না, তা যেন তারা স্বীকার করে, এবং অজ্ঞতা স্বীকার করতে তারা যেন কোন লজ্জা বোধ না করে।

কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন ছাত্র। একবার রামাজান মাসে আমি ইসফাহানের নাজাফ আবাদে গিয়েছিলাম। তখনও ক্লাশ আরম্ভ হয়নি তাই বন্ধুদের সাথে ছিলাম। একদিন আমি যখন রাস্তা পার হচ্ছি, তখন একজন গ্রামবাসী আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "জনাব আমার একটি প্রশ্ন আছে।" আমি বললাম, "কি সে প্রশ্ন!" সে বললো, "জানাবাতের গোসল কি শারীরিক না মানসিক?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি আপনার প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারছি না। জানাবাতের গোসল অন্য যে কোনো গোসলের মতই।" তারপর আমি চিন্তা করলাম, তার প্রশ্নের বিশেষ কোনো দিক থাকতে পারে; সুতরাং আবার বললাম, "এক দিক থেকে বিচার করলে এটা মনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ মানুষকে প্রথমে

পবিত্রতা অর্জনের জন্যে মনের ভিতর নিয়ত করতে হয়, আবার এটা শরীরের সাথেও সম্পর্কিত, কারণ মানুষ তার শরীরকেই ধৌত করে।" অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি উত্তর পেয়েছেন?" সে বলল, 'না'। আমি বললাম, তাহলে আমি তার উত্তর জানি না। সে তখন তার স্থানীয় উচ্চারণে প্রতিবাদ করে বললো, "তাহলে কেন তুমি এই পাগড়ী পরিধান করে আছো?" সে আরো প্রশ্ন করলো, "এই ধৌতকরণ কি আত্মাকেও পরিষ্কার করে?"

নবী সম্প্রদায় এবং সুসংবাদ

নবী-রাসূলগণের আকেটি বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা সুসংবাদ বহনকারী। পবিত্র কুরআন বলেঃ

> "হে নবী! আমরাতো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্‌বানকারী রূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে! আপনি বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দিন যে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহান অনুগ্রহ।" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৭)

সুসংবাদ হচ্ছে কাজে অনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা। যখন কেহ তার সন্তানকে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করতে চায়, তখন তা করার জন্যে দু'টি পথ থাকে; এ দু'টির যে কোনো একটি একই সময়ে গ্রহণ করা যায় অথবা একই সময়ে দু'টি পদ্ধতিই গ্রহণ করা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

১। উৎসাহ প্রদান এবং সুসংবাদ দান। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেহ তার ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে চায়, তবে সে স্কুল সম্পর্কে স্কুলে গেলে কি কি উপকার পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সমস্ত ভাল জিনিসের বর্ণনা দান করে। এটা তার ছেলেকে উৎসাহিত করবে এবং তার মনে স্কুল সম্পর্কে আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করবে।

২। খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ। একটি ছেলেকে যদি স্কুলে না যাওয়ার এবং অশিক্ষিত থাকার খারাপ ফলাফল সম্পর্কে বুঝানো যায় তবে সে স্কুলে না যাওয়ার চেয়ে বরং যাওয়াটাকেই অগ্রাধিকার দিবে।

উৎসাহ প্রদান এবং সুসংবাদ দান সব সময়ই প্রথমে আসে এবং সতর্কীকরণ আসে তারপরে। কখনো কখনো দু'টি পদ্ধতিই এক সাথে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, কারণ শুধু একটি পদ্ধতি যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। সুসংবাদ প্রদান আবশ্যকীয়, কিন্তু শুধু এটাই যথেষ্ট নয়। সতর্কীকরণ সম্পর্কেও একই কথা

প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনকে 'সাবআলমাসানী'[৫] নামে অভিহিত করা হয়। তার কারণ এই যে এতে সুসংবাদ প্রদান এবং সতর্কীকরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচারের ক্ষেত্রেও এ দু'টি পদ্ধতি এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার যাতে একটি অপরটির পরিপূরক হয়। সতর্কীকরণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সুসংবাদ প্রদানের উপর বেশী মাত্রায় জোর দেওয়া ভুল। উভয়ই ব্যবহার করা উচিত তবে সতর্কীকরণের পরিমাণ কম এবং সুসংবাদ প্রদান বেশী হওয়া দরকার। এজন্যেই পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতেই আগে "সুসংবাদ প্রদান" করা হয়েছে, তারপরে এসেছে "সতর্কীকরণ।"।

তানফীর (ভয় প্রদর্শন, পলায়নে বাধ্য করা)

"সুসংবাদ প্রদান" এবং "সতর্কীকরণ" ছাড়ও আরেকটি পদ্ধতি আছে যার নাম "তানফীর" বা "ভয় প্রদর্শন করে পলায়নের বাধ্য করা"। অনেক সময় মানুষ 'তানফীর'কে 'সতর্কীকরণ' হিসেবে ব্যাখ্যা করে। সতর্কীকরণ ব্যবহার করা হয় মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে, কিন্তু "তানফীর" ব্যবহৃত হয় মানুষকে পলায়নে বাধ্য করার জন্যে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন একটি পশুকে দড়ির সাহায্যে টানা হয়, তখন পশুটি যাতে আরো জোরে চলতে পারে সেজন্যে কেহ কেহ ভীতি সৃষ্টিকারী শব্দ সৃষ্টি করে থাকে, যদিও একই শব্দ পশুটিকে এমন ভীত করতে পারে যে সে দড়ি ছিঁড়ে পালাতেও পারে। মানুষের সম্পর্কেও একই নীতি প্রযোজ্য। অনেক সময় প্রচারকের আহবান মানুষকে বিশ্বাস ও কর্মে উদ্দীপিত করার পরিবর্তে তার মনে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে এবং যার কারণে সে প্রচারকের কাছ থেকে আরো দূরে পলায়ন করে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। দেখা যায় যে অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান কিংবা স্কুলে না যাওয়ার বিপক্ষে সতর্কীকরণের পরিবর্তে তাদের মাঝে এমন ভয়ের সৃষ্টি করেন যা তারা স্কুল থেকে পালিয়ে বাঁচে।

মহানবী (সাঃ) যখন মা'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে আল্লাহ্ বাণী প্রচারের জন্যে ইয়েমেন প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে বলেন, "হে মা'আয! মানুষদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো, এবং তাদের পলায়নের কারণ সৃষ্টি করো না। তাদেরকে

৫। সুসংবাদ এবং সতর্কীকরণ একই সাথে ৭ বার ব্যবহার করা হয়েছে বলে এ নামে অভিহিত করা হয়।

সুসংবাদ প্রদান করো এবং তাদের উপর কষ্ট চাপিয়ে দিও না।" তিনি বলেননি যে "তাদেরকে সতর্ক কর না"। কারণ সতর্কীকরণ কুরআনী বিধানেরই একটি অংশ। তিনি বলেছেন, "তাদেরকে এমন কথা বলো না যাতে তারা ইসলামকে ঘৃণা করতে পারে।"

ইয়েমেন

ইয়েমেন সেসব দেশের অন্যতম, যেসব দেশের লোকেরা কোন প্রকার চাপ বা শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো ইরানের রাজা খসরু পারভেজকে লিখিত মহানবী (সাঃ)-এর পত্র। মহানবী (সাঃ) তাঁর এ পত্রে ইরানের রাজাকে ইসলাম গ্রহণ করার আহবান জানান। মহানবী (সাঃ) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করে পত্র প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ মহানবীর (সাঃ) পত্রের প্রতি উপেক্ষা বা অসম্মান প্রদর্শন করে, আবার অনেকে সম্মানের সাথে তা গ্রহণ করে। এমনকি অনেকে মহানবীর (সাঃ) কাছে উপঢৌকনও প্রেরণ করে এবং তাঁর দূতকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে আপ্যায়িত করে। রাজা খসরু পারভেজ মহানবীর (সাঃ) পত্রের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন না করে তা ছিঁড়ে ফেলে। সে এক ব্যক্তিকে ইয়েমেনে প্রেরণ করে ইয়েমেন-রাজকে অনুরোধ করে, সে যেন অনুসন্ধান করে দেখে যে এই আরব লোকটি কে যে তাকে (খসরুকে) ইসলামের দিকে আহবান করার সাহস দেখায় এবং রাজা খসরুর নামের আগে তার নিজের নাম লেখার ধৃষ্টতা দেখায়। রাজা খসরু পারভেজ ইয়েমেনের রাজাকে আরও আদেশ দেয়, সে যেন ব্যাপারটি অনুসন্ধান করার জন্যে তার প্রতিনিধি আরবে প্রেরণ করে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) নামের লোকটিকে বন্দী করে রাজার নিকট নিয়ে এসে তার বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করে।

ইয়েমেনের রাজা খসরু পারভেজের দূতকে অনুরোধ করলো যে সেও যেন ইয়েমেন-রাজের দূতের সঙ্গী হয়ে তার চিঠি নিয়ে মুহাম্মদের কাছে যায় এবং তাঁর কাছ থেকে রাজা খসরুর জন্যে জবাব নিয়ে আসে। মহানবী (সাঃ) দূতদেরকে তাড়াতাড়ি উত্তর না দিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। তারা দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগলো। চল্লিশ দিন পর তারা বললো যে তারা আর অপেক্ষা করবে না, এবং তারা রাজার চিঠির উত্তর দাবী করলো। মহানবী (সাঃ) অবশেষে তাদেরকে বললেন, "তোমাদের রাজা তাঁর পুত্র শিরূয়ি কর্তৃক ছুরিকাহত হয়েছেন, এবং যেহেতু তিনি এখন মৃত, সুতরাং সমস্ত ব্যাপার মিটে গেছে। তোমরা এখন যেতে পারো।" তারা ফিরে গিয়ে দেখলো যে ইয়েমেনের রাজা তখনও পারস্য থেকে

রাজা খসরু মৃত্যু সংবাদ পাননি। তিনি দূতদের কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে বলে উঠলেন, "সমস্ত মহিমা খোদার! তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয় তবে তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল।" কয়েকদিন পরেই পারস্য থেকে শিরুয়ি-এর দূত এসে পৌঁছলো এবং ইয়েমেনের রাজাকে জানালো যে খসরু পারভেজ তার পুত্র শিরুয়ি কর্তৃক নিহত হয়েছেন এবং এখন শিরুয়ি রাজা হয়েছেন। দূতেরা ইয়েমেনের রাজাকে আরও বললো যে, আরবে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে দাবীকারী ব্যক্তি সম্পর্কে খসরু পারভেজের যে আদেশ ছিলো, তা যেন আর পালন না করা হয়।

ইসলাম এভাবেই ইয়েমেনে প্রবেশ করে। তাছাড়া, ইয়েমেনে বিরাট সংখ্যক ইরানীর বসবাস ছিলো, যাদের কথা আমি আমার "ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। ইয়েমেনের ইরানীরা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে, অতঃপর তারা ইরানে ইসলাম প্রচার করে। ইয়েমেনে ইরানীদের ইসলাম গ্রহণ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী আন্তরিক ছিলো। মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই ইয়েমেনের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। বাকীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্যে মহানবী (সাঃ) প্রথমে মা'আয ইবনে জাবাল এবং তারপর হযরত আলী (আঃ) কে প্রেরণ করেন। হযরত আলী (আঃ) প্রেরিত হন বিদায় হজ্জের সময়, মহানবীর (সাঃ) ইন্তেকালের দু'মাস পূর্বে।

হযরত আলী (আঃ) ইয়েমেন থেকে ফিরে মক্কায় মহানবীর (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত আলী (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর (আলীর) হজ্জের নিয়্যাত কি? হযরত আলী (আঃ) উত্তর দিরেন, "আমি মিকাতে যখন আমার নিয়্যাত করি, তখন আমার ইচ্ছা ছিলো যে আমি ঠিক সেই নিয়্যাত করি যে নিয়্যাত আপনার অনুরূপ।" মহানবী (সাঃ) বললেন যে, এটাই সঠিক এবং উত্তম। মা'আয (রাঃ) কে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় মহানবী (সাঃ) তাঁকে উপদেশ দেন যে তিনি ইয়েমেনের মানুষদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন এবং তাদেরকে ভয় দেখিয়ে ইসলাম থেকে বিতাড়ন করা থেকে বিরত থাকেন। মানুষের মন অত্যন্ত নাজুক এবং খুব তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষের মনের উপর খুব বেশী চাপ প্রয়োগ করলে তা পলায়নের পথ খোঁজে। যেমন মহানবী (সাঃ) ইবাদাতের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন যে, সেই পরিমাণ ইবাদতই করা উচিত যা কোন চাপ অনুভব না করে খুব সহজভাবে প্রতিদিনের কর্ম হিসেবে বজায় রাখা যাবে। কারো উচিত নয় নিজের উপর বোঝা চাপানো, কারণ তাতে তার আত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে একটি খারাপ চেতনা সৃষ্টি করবে।

মহানবী (সাঃ) জাবের (রাঃ)কে বলেনঃ

"দেখ এ ধর্ম একটি শক্ত দুর্গ বিশেষ। সুতরাং এতে প্রবেশ কর নম্রতা ও বিবেচনা সহকারে। যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে কিংবা সংক্ষিপ্ত পথ খোঁজার চেষ্টা করে, সে কোনো গন্তব্যে পৌছায় না, এবং তার বাহন ঘোড়া আহত হয়ে পড়ে। জমি এমনভাবে আবাদ করো যেন তুমি সেখানে চিরদিন বাস করবে। এবং কাজ এমনভাবে করো যেন তুমি আগামীকালই মৃত্যু বরণ করবে।" (সফিনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩২)

ইসলাম মনের প্রশান্তির ধর্ম, সুতরাং নিজের কাছে নিজে যুক্তিসঙ্গত হও। যারা মনে করে যে তারা নিজেদের উপর বেশী বোঝা চাপিয়ে তাদের গন্তব্যে পৌছতে পারবে, তারা ভুল করে। এ রকম লোকেরা কোনদিন গন্তব্যে পৌছতে পারবে না। এরা সেই লোকের মতো, যে লোক তার ঘোড়া চালিয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে যায় আর ভাবে যে সে খুব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে খুব অল্প সময়েই তার গন্তব্যে পৌছে যাবে। সে হয়ত অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কিছু দূরত্ব প্রকৃতই অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করে যে, সে তার গন্তব্যে পৌছতেই শুধু ব্যর্থ হয়নি, বরং তার ঘোড়াকেও আহত করে।

যে ব্যক্তি নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা গ্রহণ করে, সে হয়ত চিন্তা করতে পারে যে সে অন্যের চেয়ে অধিকতর দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে তার বাঞ্ছিত গন্তব্যে পৌছতে পারবে না, বরং সে তার চলার স্পৃহা হারিয়ে ফেলবে, যেমন একটি ঘোড়া আহত হয়ে আর হাঁটতে পারে না।

একজন মুসলমান ছিলো, তার ছিলো এক খৃষ্টান প্রতিবেশী। খৃষ্টান লোকটি ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার মুসলিম প্রতিবেশীর সহায়তায় ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার ইসলাম গ্রহণের পরের দিন খুব সকালে তার দরজার বাইরে কারো করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল। তার উত্তরে জানতে পারলো যে তাকে মসজিদে নিয়ে যাবার জন্যে তার মুসলিম প্রতিবেশী এসেছে। তারা একত্রে মসজিদে গেল এবং সকালের নামায আদায় করল, নাফিল্লাহ্ নামায, সূর্যোদয়-পূর্ব নামায ও সূর্যোদয়-উত্তর নামায ও অন্যান্য নামায সমাধা করলো। অতঃপর তারা সেখানেই দুপুরের নামাযের সময় পর্যন্ত অবস্থান করলো এবং তারপর সান্ধ্য নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলো। তারপর মুসলিম ব্যক্তি তার

নব-দীক্ষিত মুসলিম প্রতিবেশীর দিকে ফিরে বললো, "আসুন আমরা আগামীকাল রোজা রাখার নিয়্যাত করি।"

পরের দিন আবার যখন মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে মসজিদে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকতে গেল, তখন সে লোক বলল, "আমি আর যাব না। তুমি যে ধর্মের চর্চা করো, তা সে সমস্ত লোকের জন্যে ভালো হতে পারে যাদের একমাত্র বন্দেগী করা ছাড়া আর কোনো কাজ নাই। আমি এখন আর মুসলমান নই।" (দাস্তানে রাস্তান)

ইমাম সাদিক (আঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, "এ লোকটির মত হয়ো না যে একজন খৃষ্টানকে ইসলাম গ্রহণে সাহায্য করে, কিন্তু তার আচরণেই আবার সে লোক ইসলাম থেকে পলায়ন করে।" এমন অনেক ব্যাপার আছে যা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে ভীত করতে পারে। কখনো কখনো একজন মুসলমানের শুধুমাত্র দর্শন বা চেহারা দেখেও একজন অমুসলিম ইসলামকে ঘৃণা করতে পারে, অথচ ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং নবী পাক (সাঃ) তাঁর যুগের সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন, এবং তিনি এখন বেঁচে থাকলে এ যুগেরও সর্বাপেক্ষা বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ থাকতেন।

তার্কিকরা মনে করেন যে নবী হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম শর্ত এই যে, নবী এবং ইমামদের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে না, যার কারণে মানুষ তাঁদেরকে ঘৃণা করতে পারে। নবী ও ইমামদের কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকে না, কারণ তা থাকরে মানুষের মনে অনীহা ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে পারে। তাঁদেরকে হতে হবে আকর্ষণীয়, অথবা কমপক্ষে এমন যাতে তাঁদের দর্শন অন্যের বিতৃষ্ণার কারণ না হয়।

ইসলামের যিনি প্রচারক, তাঁরও অনুরূপ গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। তাঁর কথাবার্তা এমন হবে না যা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে-তাঁর কথা না হবে অধিক ভর্ৎসনামূলক, না হবে অধিক কর্কশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত ভর্ৎসনা কিছু ফলপ্রসূ হতে পারে। হয়ত কোন অন্যায়কারী কখনো কারো নিন্দা-ভর্ৎসনায় তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিন্দা-ভর্ৎসনা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

কেহ কেহ সর্বদাই ধার্মিক হবার সমস্যার উপরই খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) আম'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে বলেন, "লোকের জন্যে এটিকে সহজ করে দাও, এবং এটাকে কষ্টকর, ভারী করে তুল না।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ আমাকে এমন জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যা ক্ষমাশীল এবং উদার।"

এখন দেখা যাক, একটি ধর্ম কেমন করে অধিক নমনীয় বা উদার হতে পারে। ধর্মের কিছু বিধান বা নীতিমালা আছে। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মের বিধান অনুযায়ী অযু করা অবশ্য করণীয় কাজ; কিন্তু যদি কারো কোন ক্ষত কিংবা অসুস্থতা থাকে, যা পানির দ্বারা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে তার জন্যে অযু করা জরুরী নয়।

এভাবেই ধর্ম উদারতার নীতিকে গ্রহণ করে। ইসলাম বিধিগত কঠোরতা ও একগুয়েমীর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম নয়, বরং এর বিধান নমনীয় এবং উদার। ইসলামের রোজা রাখা বাধ্যতামূলক, ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ছেড়ে দেওয়া মহাপাপ; কিন্তু একই সময়ে ইসলাম বলে যে যদি তুমি সফরে থাকো, কিংবা অসুস্থতার কারণে রোজা তোমার জন্যে ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি পরবর্তীতে যে কোন সুবিধামত সময়ে রোজা করতে পারো।

> " ..... এবং তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা যে সফরে থাকে, সে একই সমান রোজা অন্য দিনগুলোতে করতে পারে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সহজ করে দিতে চান, তিনি তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করতে চান না।" (আল কুরআন ২ ঃ ১৮৪)

যদি তোমার আশংকা হয় যে তোমার জন্যে রোজা রাখা অথবা অযু করা ক্ষতিকর হতে পারে, তবে তা করা থেকে বিরত থাক, যদি তোমার আশংকা কোন অবিশ্বাসী বা বিধর্মীর মেডিক্যাল রিপোর্টের ভিত্তিতে হয়, তবুও। এ ছাড়াও আরো অনেক অবস্থা আছে যখন মুসলমান রোজা রাখা থেকে অব্যাহতি পায়, যেমন বার্ধক্য এবং গর্ভবতী অবস্থা।

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ হাজী শাইখ আব্দুল করিম হায়ারী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বৃদ্ধ বয়সেও দুর্বল অবস্থায় রোজা রাখতেন, যদিও সে অবস্থায় রোজা রাখা তাঁর জন্যে খুবই কষ্টকর ছিলো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আপনার গ্রন্থে লিখেছেন যে বৃদ্ধ লোকদের জন্যে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়, অথচ আপনি নিজেই রোজা রাখছেন এর কারণ কি?" তিনি বললেন, তিনি যে কথা

লিখেছেন তা ঠিক, এবং তিনি যেহেতু অত্যন্ত বৃদ্ধ তাই তাঁর জন্যে রোজা রাখা জরুরী নয় এ কথাও ঠিক। তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে কেন রোজা ভাঙছেন না! তিনি জবাবে বললেন যে, তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি তাঁকে রোজা ভাঙা থেকে বিরত রাখছে। ইসলাম উদার প্রকৃতির ধর্ম, এবং এই উদারতাই মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। এজন্যেই মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ একজন প্রচারকের উচিত ধর্মের সহজ এবং উদার দিকটিও প্রচার করা, এবং তাঁর উচিত কাজকর্মে একটি বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করা যাতে লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

চতুর্থ অধ্যায়

খোদাভীতি ও ভয়

মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবানের আরেকটি শর্ত হচ্ছে খোদ-ভীতি এবং ভয়ের প্রশ্ন। পবিত্র কুরআন বলেঃ

"যারা আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে, এবং তিনি ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না।"

এটি কুরআনের সে আয়াতসমূহের অন্যতম যেখানে মানুষের উপর দায়িত্বের ভারী বোঝা অর্পণ করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা দ্বীনের প্রচারক, যারা আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে, তাদেরকে অবশ্যই দু'টি যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

প্রথমতঃ তাদের নিজেদের মধ্যে খোদা-ভীতি থাকতে হবেঃ

" ..... আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে ..... ।"
(আলকুরআন, ৩৫ ঃ ২৮)

মহানবী (সাঃ)-এর একটি দোয়া যা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রিতে, দ্বাদশ ইমামের জন্ম বার্ষিকীতে, পাঠ করার জন্যে বলা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

"হে খোদা! আমাদের মধ্যে তোমার ভয়দান করো, যাতে তা খারাপ কাজ করা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখে: এবং আমাদেরকে তোমার আনুগত্য দান করো যাতে তা আমাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে, এবং আমাদেরকে তোমার ঈমান দান করো, যাতে আমরা এ দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট কঠোরতা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি।" (মাফাতিহ আ'ল-জিনান)।

একজন প্রচারকের উচিত খোদাকে এরূপ ভয় করা যেন খোদার প্রতি তাঁর ভয় এবং খোদার বিরাটত্বের চেতনা তাঁর মন-মস্তিষ্ক এবং ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করে; ফলে তাঁর মনে যদি কখনো খারাপ কিছু করার ইচ্ছা জাগে, তবে খোদা-ভীতি ও খোদার চেতনাই তাঁকে বাধা দিবে।

প্রচারকের দ্বিতীয় যে যোগ্যতা বা গুণ থাকা দরকার তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও ভয় না করা।

খোদা-ভীতি এবং সাধারণ ভয়ের মধ্যে পার্থক্য

খোদা-ভীতি এবং সাধারণ ভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ ভয় মানুষের ভবিষ্যৎ এবং পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে খোদা-ভীতি মনের এমন এক অবস্থার নাম, যে অবস্থায় মানুষ কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না। পবিত্র কুরআন বলে যে, যারা আল্লাহ্‌র পথের প্রচারক তারা তাঁকে এরূপ ভয় করে যে তারা কোনরূপ অন্যায় কাজতো করতে পারেই না, এমন কি তাঁর প্রতি আনুগত্যে সামান্যতম অবহেলাও প্রকাশ করতে পারে না। অন্যদিকে তারা খোদা ছাড়া আর যে কারোরই সম্মুখীন হোক না কেন, তারা সেখানে নির্ভীক এবং বেপরোয়া থাকে।

দৃঢ়তা

নবীদের এবং বিশেষভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দৃঢ়তা এবং সাহস।

একজন পশ্চিমা লেখক একটি বই লিখেছেন যার নাম, "Mohammad (S), a prophet whom we should know again" "নবী মুহাম্মদ (সাঃ), যাঁকে আমাদের আবার জানা প্রয়োজন"। অনেক ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও, এ বইয়ের দু'টি কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার। এ দু'টি বিষয় এ বইয়ে খুব ভালভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং সম্ভবতঃ আর কোনো বইয়ে এ দুটি বিষয়কে এত সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়নি। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে মহানবী (সাঃ)-এর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্নতা এবং মহা প্রজ্ঞাশীলতা, যা এমনকি অমুসলিমরাও অস্বীকার করতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা অর্থাৎ যে কোন পরিস্থিতিতে একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য যে কেহ হলে আশা হারিয়ে ফেলতো এবং পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসতো। কিন্তু মহানবী (সাঃ) সকল পরিস্থিতিতে পাহাড়ের মতো অটল এবং স্থির থেকেছেন।

উপদেশ প্রদান (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে স্মরণ করানো)

ইসলামের প্রতি আহবান এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে উপদেশ প্রদান (বা প্রকৃত মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া)। পবিত্র কুরআন এর উল্লেখ করেছেঃ

> "এবং তুমি তাহাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকার করে থাকে।" (আল কুরআন, ৫১ ঃ ৫৫)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

> "হে নবী, তুমি তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমিতো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র। তুমি তাদের উপর পাহারা দানকারী তো নও। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে আল্লাহ তাকে কঠিন-কঠোর শাস্তি দেবেন।" (আল কুরআন, ৮৮ ঃ ২১-২৪)

চিন্তার জাগ্রতকরণ এবং স্মরণ করানো

কুরআন পাকে দু'টি বিষয় পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছেঃ চিন্তার জাগ্রতকরণ এবং স্মরণ করানো।

চিন্তার জাগ্রতকরণ অর্থ কোনো জিনিস সম্পর্কে চিন্তা জাগানো যে সম্পর্কে একজন কিছু জানে না এবং যে সম্পর্কে সে অজ্ঞ তা প্রকাশ করে দেওয়া। স্মরণ করানো অর্থ একজন যা ইতিপূর্বেই জানে তা স্মরণে এনে দেওয়া। অন্য কথায় মনের দু'টি অবস্থা আছে, যথা অজ্ঞতা এবং সুপ্ততা। একজন হয়তো তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ, কারণ সে সচেতন এবং জাগ্রত নয়। আবার একজন হয়তো তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ, কারণ সে ঘুমন্ত কিংবা স্বপ্নের অবস্থায়, এবং সেহেতু সে তার জ্ঞানের ব্যবহার করতে পারে না। এটা বাহ্যতঃ স্বপ্নের অবস্থা। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে (সাঃ) স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি শুধু অজ্ঞ লোকদেরই সম্মুখীন হবেন না বরং উদাসীন বা অবহেলাকারী লোকও পাবেন। এজন্যে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদশে দেন যেন নবী (সাঃ) অজ্ঞ লোকদের চিন্তাকে জাগ্রত করেন যাতে তারা জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু যারা জ্ঞানসম্পন্ন এবং উদাসীন, তাদেরকে কেবল স্মরণ করিয়ে দেবেন। লোকেরা বেশীর ভাগই উদাসীন। কিন্তু একেবারে অজ্ঞের সংখ্যা খুব অল্প। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ দেন যে তিনি উদাসীন বা অবহেলাকারী লোকদেরকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং যারা অজ্ঞ তাদের চিন্তা-ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবেন, যাতে করে তারা নিজেরা যখন সচেতন

হবে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজবে। যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে এবং তার ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। যদি আপনি এ ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলেন, তবে সে নিজেই দৌড়ে ট্রেন ধরতে যাবে। এ সময় ঘুম যে ক্ষতিকর এ কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না। মানুষের লুকায়িত চেতনা-অনুভূতি এ রকমই। নবী পাক (সাঃ) এ চেতনা-অনুভূতি জাগাবার জন্যেই এসেছেন। একজনের ভিতরে যে লুকায়িত চেতনা-অনুভূতি আছে তাকে নিজের জ্ঞান-বিবেকের কাছে জাগ্রত করার মাধ্যমেই ঈমান জাগ্রত হয়। এজন্যে ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

> "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। নির্ভুল ও সঠিক পথকে ভুল পথ ও চিন্তাধারা হতে পৃথক করে দেয়া হয়েছে! এবং যে সব অসত্য শক্তিকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধারণ করেছে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নহে। আল্লাহ্ সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সব কিছু জানেন।" (আলকুরআন, ২ ঃ ২৫৬)

ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এবং যে ঈমানের জন্যে নবীদের আহবান তা কোন বাহ্যিক এবং দমনমূলক ধর্ম নয়। ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস, আগ্রহ এবং প্রবণতার একত্রিত নাম। সুতরাং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তা অর্জন করা যায় না। এর সঠিক পন্থা হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের নিকট আবেদন এবং সুন্দর পরামর্শ ও সদুপদেশ।

হযরত আলী (আঃ) একবার বললেন, "হে লোকেরা! আমাকে হারানোর পূর্বেই তোমরা আমার নিকট থেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও। তোমরা আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পার, আমি তার উত্তর দিব। পার্থিব বিষয়াদির চেয়ে অনেক ভালভাবে অপার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কিত উত্তরসমূহ আমার জানা আছে।" এমন সময়ে এক আরব ইহুদী কর্কশ ভাষায় প্রতিবাদ করে বললো, "হে উদ্ধত ব্যক্তি! তুমি যে বিষয় জান না, তা জানার দাবী করছো। যে কোনো প্রশ্ন করলে কি তুমি তার উত্তর দিতে পারবে?" হযরত আলী (আঃ)-র সঙ্গীদের কেহ কেহ তাকে কড়া উত্তর দিতে চাইলেন, কিন্তু হযরত আলী (আঃ) তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথকে বাস্তবায়ন করা যায় না। এ লোকটির যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে, তবে তাকে সুযোগ দাও, সে আমাকে প্রশ্ন করবে। যদি আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারি, তবে সে রূঢ় ব্যবহারের জন্যে নিজেই লজ্জিত হবে এবং তার আচরণ পরিবর্তন করবে।"

যুক্তির মাধ্যমে খোদায়ী জ্ঞানকে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করার চাবিকাঠি হচ্ছে ভদ্রতা প্রদর্শন এবং মানুষের হৃদয়, আত্মা ও চিন্তার নিকট আবেদন জানানো। দাওয়াত পেশ করার এটাই সঠিক পন্থা।

ইমাম হুসাইন (আঃ) যখনই কোন শত্রুর সম্মুখীন হতেন, তিনি খুব সাহসের সঙ্গে তার সাথে লড়াই করতেন। কিন্তু যখন তিনি এমন লোকের সম্মুখীন হতেন যাকে তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করতেন, তার সাথে খুব নম্র ব্যবহার করতেন এবং তার মনোযোগের অভাবকে উপেক্ষা করতেন।

অনেকে এ প্রশ্ন তুলেন যে ইসলামে মানুষকে খোদার পথে আহবানের পন্থা কি জোরজবরদস্তিমূলক না কি স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে। আসলে খৃষ্টান পাদ্রীরা ইসলামের সমালোচনা করার জন্যে এ প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে, এবং বলে যে "ইসলাম তরবারির ধর্ম"। তারা ইসলাম সম্পর্কে এ ভুল ধারণা নিয়েছে যে ইসলাম শক্তি ভিত্তিক ধর্ম। অথচ পবিত্র কুরআন বলেঃ

> "মানুষকে তোমার প্রভুর পথে ডাক বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে, এবং তাদের সাথে আলোচনা করো উত্তম পদ্ধতিতে।"
>
> (আল কুরআন, ১৬ ঃ ১২৫)

খৃষ্টানরা তাদের কোন কোন বইয়ে ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে দেখায় যে একজন মানুষ এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তরবারি নিয়ে অন্য একজন মানুষের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ দিয়ে তারা এটা বুঝাতে চায় যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম তরবারিধারী ব্যক্তির কাছে হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তরবারির নীচে তার প্রাণ দিবে। দুঃখের বিষয়, অনেক অজ্ঞ মুসলমান খৃষ্টানদের মতোই কথা বলে। অথচ, পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না। এ অজ্ঞ মুসলমানরা শত্রু খৃষ্টানদের সমালোচনাকেই সমর্থন করে।

তারা বিভিন্ন বিষয়ের অপব্যাখ্যা করে এবং একটি বিষয়ের আংশিক মাত্র উল্লেখ করে ইসলামকে একপেশে হিসেবে চিত্রিত করে শত্রুদের জন্যে সমালোচনার অজুহাত সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামের অপবাদ দেওয়ার জন্যে তারা বলে থাকে যে ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের কারণ ছিলো দু'টি বিষয়ঃ বিবি খাদিজার সম্পদ এবং হযরত আলী (আঃ)-র তরবারি। তাদের শব্দ দু'টি লক্ষ্য করুনঃ সম্পদ! এবং শক্তি! যদি কোনো ধর্ম সম্পদ এবং শক্তির জোরে বিস্তৃতি লাভ করে থাকে তবে সেটা কি ধরনের ধর্ম হতে পারে?

অথচ পবিত্র কুরআনের কোথাও একবারের জন্যেও এমন কোন কথার উল্লেখ নেই যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে ইসলামের বিস্তৃতি এ পথে ঘটেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিবি খাদিজার সম্পদ ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়েছে, কিন্তু এর মানে এ নয় যে, মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে অর্থ দেয়া হয়েছে। তিনি তা কখনোই করেননি। বরং তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দরিদ্র মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সাহায্য করার জন্যে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দিয়ে দেন। তিনি অন্যদের তুলনায় সম্পদশালিনী ছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগের পরিভাষা অনুযায়ী কোন পুঁজিপতি বা কোটিপতি ছিলেন না। মক্কা ছিলো একটি ছোট্ট শহর, এবং বিবি খাদিজার সম্পদ না পেলে হয়ত দারিদ্র মুসলমানদেরকে জর্জরিত করে তুলতো। বিবি খাদিজার সম্পদ মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলো, কিন্তু এ অর্থে নয় যে মানুষকে মুসলমান বানাবার কাজে তা ঘুষের মত ব্যবহার করা হয়েছে। বরং এ সম্পদ দারিদ্র পীড়িত মুসলমানদের জীবন রক্ষা করেছে। আলী (আঃ)-র তরবারিও ইসলামের প্রসারে সাহায্য করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আলী (আঃ)-র তরবারি ছাড়া হয়ত ইসলামের ভাগ্য ভিন্ন প্রকৃতির হতো।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে হযরত আলী (আঃ) তাঁর তরবারির সাহায্যে মানুষকে মুসলমান হতে বাধ্য করেছেন। বরং বিপরীত পক্ষে, শত্রুরা যখন শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে, তখন হযরত আলী (আঃ) ইসলামের প্রতিরক্ষায় সাহসের সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করেছেন। অতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে হযরত আলী (আঃ)-র তরবারি ইসলামকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধে, যখন অবিশ্বাসী কুরাইশরা এবং তাদের সহযোগী অন্য গোত্রগুলি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদেরকে অবরোধ করে, তখন মুসলমানরা এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে মুসলমানদের অবস্থা খবুই শোচনীয় ছিলো এবং বাহ্যত তাদের সামনে কোন আশা ছিলো না।

নগরীর চারিদিকে মুসলমানদের খননকৃত পরিখা বেষ্টনকারী আমরু-বিন-আবদুদ এবং তার বাহিনী এমন একটি জায়গা খুঁজে পায়, যেখান দিয়ে তারা ঘোড়ায় চড়ে লাফ দিয়ে মুসলমানদের সম্মুখীন হয়। তারপর তারা মুসলমানদেরকে যুদ্ধে আহবান করতে থাকে। তখন কেবলমাত্র যুবক আলী, যার বয়স বিশের ঘরে, উঠে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে নবী পাক (সাঃ)-এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন না, কারণ তিনি তাঁর অন্য সাহাবীদেরকে সুযোগ দিতে চাইলেন। এদিকে আমরু

ইবন-আবদুদ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যুদ্ধের আহবান জানাতেই থাকে। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত আছে কি না। কিন্তু কেহ উঠে দাঁড়ালেন না। হযরত আলী (আঃ) আবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁকে এবারও অনুমতি দিলেন না। তিন বা ততোধিক বার এরূপ ঘটলে আমরু-বিন-আবদুদ এমন কথা বললো যা মুসলমানদের মর্মমূলে গিয়ে স্পর্শ করে। সে বললোঃ

> "আমি বিপক্ষকে যুদ্ধে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তাদের কাউকেও দেখছি না। হে মুসলমানেরা, তোমাদের মধ্যে কি একজন মানুষও নেই? তোমরাতো দাবী কর যে তোমাদের শহীদরা জান্নাতে যাবে এবং আমাদের মৃতেরা জাহান্নামে যাবে। যদি তাই হয়, তবে কেন তোমরা আমার সাথে যুদ্ধে নামতে সাহসী হচ্ছো না? আমাকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠাতে কিংবা তোমাদের কেহ আমার হাতে নিহত হয়ে জান্নাতে যাবার জন্যে কেন এগিয়ে আসছ না?"

এতে হযরত আলী (আঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অধৈর্য হয়ো না! আমি আছি তোমার প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা হিসেবে।"

অবশেষে নবী পাক (সাঃ) ঘোষণা করলেন, "সমগ্র ইসলামী বিশ্বাস এখন সমগ্র কুফরির সম্মুখীন।" তখন হযরত আলী (আঃ) আমরু ইবন-আব্দুদের মোকাবেলা করে তাকে হত্যা করেন। এভাবে ইসলাম রক্ষা পায়। সুতরাং যখন বলা হয় যে, হযরত আলীর (আঃ) তরবারি ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছে, এবং তাঁর তরবারি ছাড়া ইসলাম থাকত না, তখন তার মানে এ নয় যে, হযরত আলী (আঃ)-র তরবারি মানুষকে মুসলমান হতে বাধ্য করেছে, বরং তার অর্থ এই যে ইসলামের প্রতিরক্ষায় হযরত আলী (আঃ)-র তরবারি ব্যবহৃত না হলে শত্রুরা ইসলামের বেশী ক্ষতি করতে পারতো। ইসলাম তরবারির ধর্ম, কিন্তু সেই তরবারির, যা মুসলমান সমাজ, তাদের ভূমি এবং তাদের একত্ববাদ তাওহীদকে রক্ষার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত।

যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত এবং নীচের আয়াত প্রসঙ্গে মরহুম আল্লামা তাবাতাবা'ই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

> "ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল পথকে মিথ্যা ও ভুল পথ হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছে।"
>
> (আল কুরআন, ২ ঃ ২৫৬)।

তিনি বলেন যে, যখনই একত্ববাদ বিপদাপন্ন হয়েছে, তখনই ইসলাম তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। কারণ একত্ববাদ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মানবীয় মূল্যবোধ। যারা মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলে, তারা অবগত নয় যে একত্ববাদ স্বাধীনতার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। একজনের নিজের জীবন, সম্পদ, সম্মান এবং ভূমি রক্ষা করা নিশ্চিতভাবেই সঠিক কাজ, কিন্তু একজন মজলুমকে রক্ষা করা অনেক বেশী পবিত্র। কারণ এতে শুধু একজনের নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষার বিষয় জড়িত নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিদ্যা রক্ষা করা পবিত্র এবং সম্মানজনক কাজ। একত্ববাদ শুধু একজন ব্যক্তির সাথে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির সাথে সম্পর্কিত। এটা মানুষের প্রকৃতির অংশ, এবং মানুষের চিন্তা-বিবেক কখনো তাকে একত্ববাদের বিপরীত পথে পরিচালিত করতে পারে না। সমস্ত ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াদি থেকে একত্ববাদকে মুক্ত রাখার জন্যেই আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনের নির্দেশনামা প্রেরণ করেছেন। যখন সেগুলো দূরীভূত হয়, তখন একত্ববাদ তার স্বরূপে প্রকাশ পায়। পবিত্র কুরআনে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গল্পে বলা হয়েছেঃ

"আমরাতো এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমরা তার সম্পর্কে অবগত ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও নিজ জাতির লোকজনকে বললঃ এ মূর্তিগুলো কি রকম যেগুলোর জন্যে তোমরা পাগলপ্রায় হয়েছ?" তারা জবাবে বললোঃ "আমরা আমাদের বাপদাদাকে এগুলোর এবাদত করতে দেখেছি"। সে বললোঃ "তোমরাও বিভ্রান্ত আর তোমাদের পিতৃপুরুষরাও বিভ্রান্তিতে ছিলো।"

তারা বললো ঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছো?

সে বললো ঃ না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এই বিষয়ে সাক্ষাৎ দিচ্ছি। আল্লাহ্র শপথ, তোমরা চলে গেলে তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে আমি অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।"

অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণবিচুর্ণ করে দিলো, কিন্তু এদের প্রধান মূর্তিটিকে রেখে দিলো, যাতে তারা এর শরণাপন্ন হয়।

তারা বললো ঃ আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এইরূপ কে করলো? সে নিশ্চয় সীমালংঘনকারী।

কেহ কেহ বললো ঃ এক যুবককে এদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইব্রাহীম বলে ডাকা হয়। তারা বললো ঃ তাহলে তাকে এখানে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত কর, যাতে লোকেরা তাকে দেখে সাক্ষ্য দিতে পারে।

তারা বললো ঃ হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলোর প্রতি এরূপ আচরণ করেছো?

সে বললোঃ এদের এই প্রধানই তো করেছে। এদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না, যদি এরা কথা বলতে পারে। তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো ঃ তোমরাইতো সীমালংঘনকারী। অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেলো এবং তারা বললো ঃ তুমি তো ভালই জান যে এরা কথা বলে না।

ইব্রাহীম বললো ঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন জিনিসের ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, কোন ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক, তোমাদেরকে, এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

তারা বললো ঃ তবে একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, এবং তোমাদের দেবতাগুলোকে সাহায্য কর! প্রকৃতই যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

আমরা তখন বললামঃ হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্যে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইব্যাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটতে চাইলো। কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" (আল কুরআন, ২১ ঃ ৫১-৭০)

সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সমস্ত বাধা অপসারিত করেছিলেন এবং মানুষেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের আপন বৈশিষ্ট্য ফিরে পেয়েছিলো। এখন লোকেরা মূর্তি বিশিষ্ট মন্দিরে প্রবেশ করে অথচ মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না, কারণ যে কোন আদর্শ অনুসরণের স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বৃটেনের রাণী হিন্দুদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন, অথচ এ বিশ্বাস পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ এবং এক গাদা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, যা মানুষের হাত পা-কে মৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে।

যে ব্যক্তি তার হৃদয় থেকে কথা বলে, সে অন্যের হৃদয় জয় করতে পারে। এবং যে ব্যক্তি শুধু তার মুখ থেকেই কথা বলে, তার কথা অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যারা আল্লাহ্‌র পথে বাণী প্রচারক তারা প্রকৃতই আন্তরিক, কিন্তু যারা শুধু জাগতিক নেতা তাদের বাণী প্রচার আন্তরিক হয় না।

ইরান থেকে যারা ভারতে গিয়েছিলো, তারা সেখানে জরদশতের মতবাদ প্রচার করার জন্যে কোন কর্মতৎপর দল গঠন করতে পারেনি। ইসলামের একটি বিষয়ে খৃষ্ট ধর্মের সাথে মিল আছে যে ইসলাম মানব জাতির সম্মুখে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এবং ইসলাম প্রথম যেখানে আবির্ভূত হয় সে আরবের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। বর্তমানে ইসলাম এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্ব জুড়েই প্রসার লাভ করেছে এবং বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে। এজন্যে বর্তমান পৃথিবীতে খৃষ্টানদের চেয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। যদিও খৃষ্টানরা মুসলমানদের সংখ্যা সব সময় কম করে দেখায়, এবং বেশীর ভাগ পরিসংখ্যানই আসে পশ্চিম সূত্র থেকে, তবুও গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, মুসলমানদের সংখ্যা খৃষ্টানদের চেয়ে বেশী। ইসলামের দ্রুত প্রসারের এই বৈশিষ্ট্য খৃষ্টান ধর্মে নেই। খৃষ্ট ধর্মের অগ্রগতি ঘটেছে খুব ধীরে ধীরে, অপরপক্ষে ইসলামের প্রসার ঘটেছে খুবই দ্রুত গতিতে, শুধু আরবে নয়, বরং এশিয়া, আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। ইসলামের এত দ্রুত বিস্তার দেখে গবেষকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। একজন ফরাসী কবি বলেছেনঃ তিনটি ব্যাপারে ইসলামের পবিত্র নবী অনন্য, তুলনাহীনঃ

১। বস্তুগত উপায় উপকরণের অভাব। একজন একাকী মানুষ পথে নেমে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকেন, তাঁর বস্তুগত কোন ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি নেই। এমনকি যারা নিকটতম ব্যক্তি, তারাও তাঁর পরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং তাঁর বিরোধিতায় নামে। তিনি সহায় সম্বলহীন একা মানুষ। তিনি একা তাঁর কাজ আরম্ভ করেন অতঃপর স্ত্রী এবং চাচাত ভাই আলী তাঁর সাথে যোগ দেন। ধীরে ধীরে আরো মানুষ ইসলামে যোগ দেয় এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়।

২। দ্বিতীয় যে বিষয়ে ইসলামের নবী অনন্য, তা হচ্ছে খুব অল্প সময়ে ইসলামের অতি দ্রুত বিস্তৃতি।

৩। লক্ষ্যের মহত্ব ও গুরুত্ব। তাঁর লক্ষ্যের গুরুত্ব এবং তাতে পৌছাবার জন্যে বস্তুগত উপায় উপকরণের অভাব থাকা সত্ত্বেও যে গতিতে তিনি লক্ষ্যে পৌছেছেন তাতে আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে ইসলামের নবী সমগ্র জগতে একক, অনন্য।"

ইসলামের অগ্রগতির কারণ

১। ইসলামের অগ্রগতির অন্যতম কারণ মহানবী (সাঃ)-এর অতি উত্তম আচার ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈশিষ্ট্য, এবং তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতি।

২। আরেকটি কারণ পবিত্র কুরআন মজিদ যা পবিত্র নবী (সাঃ)-এর একটি জীবন্ত মোজেজা। আল কুরআনের অতুলনীয় সৌন্দর্য, গভীরতা এবং আকর্ষণীয় শক্তি ইসলামের প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছে।

৩। মহানবী (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণাবলী।

৪। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহাসিক জীবন চরিতের প্রভাব। পবিত্র কুরআনে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি খোদার বাণী এভাবে এসেছেঃ

> "আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করো; জেনে রাখ, যারা তাঁর উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন।" (আল কুরআন, ৩ঃ ১৫৯)

এ থেকে দেখা যায় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদেরকে আকর্ষণের একটি উপাদান ছিলো। যে নেতা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকতে চান, তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই ভদ্র এবং কোমল হ'তে হবে। এ পবিত্র আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ বাণী এই যে একজনকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নমনীয় হতে হবে কিন্তু নীতির প্রশ্নে নয়। নীতির প্রশ্নে মহানবী (সাঃ) খুবই দৃঢ় থাকতেন এবং কোন নমনীয়তা প্রদর্শন করতেন না।! যদি কেহ তাঁকে অপমান করত, তিনি সদয়ভাবে তাকে ক্ষমা করে দিতেন, কারণ সেটা তাঁর নিজের সাথে জড়িত। কিন্তু কখনো কেহ ইসলামী নীতি লংঘন করলে, তিনি তার সাথে কড়া আচরণ করতেন।

একবার কোন এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) কে পথে থামিয়ে দাবী করে যে মহানবী (সাঃ) তার কাছে কিছু পরিমাণ অর্থে ঋণী আছেন, এবং সে তাঁকে কিছুতেই যেতে দেবে না যতক্ষণ না সে তার প্রাপ্য অর্থ সেখানেই পায়। মহানবী (সাঃ) বললেন, "আমারতো কারো কাছে কোন ঋণ নেই, তবু যদি কিছু থেকেই থাকে, আমাকে যেতে দাও, আমি তোমার দাবীকৃত অর্থ এনে দেই।" কিন্তু

লোকটি বললো যে, সে নবীজীকে (সাঃ) এক পাও যেতে দিবে না। মহানবী (সাঃ)-এর ভদ্র ব্যবহারকে উপেক্ষা করে লোকটি তাঁর সাথে অভদ্র ব্যবহার করতে থাকে এবং মহানবী (সাঃ)-এর জামা খুলে নিয়ে তাঁর গলায় পেঁচিয়ে টানতে চেষ্টা করে। এমনকি এতে মহানবী (সাঃ) তাঁর কাঁধে আঘাত পান। মহানবী (সাঃ) তখন মসজিদে যাবার পথে ছিলেন, এবং মসজিদে সমবেত লোকেরা যখন দেখলো যে মহানবী (সাঃ) এখনো আসছেন না, তখন তারা তাঁর অনুসন্ধানে বের হলো এবং গিয়ে দেখতে পেলো যে এক ইহুদী তাঁকে পথে আটকিয়ে রেখেছে। মুসলমানরা এ ইহুদী অসভ্য লোকটিকে চপেটাঘাত ও শাস্তি দিতে চাইলো। কিন্তু মহানবী (সাঃ) বললেন, "না, তোমরা এতে হস্তক্ষেপ করো না। আমি জানি আমার বন্ধুর সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয়।" তাঁর এরূপ মহানুভবতা এবং দয়া দেখে ইহুদী সাথে সাথেই মুসলমান হয়ে গেলো এবং বললো, "আপনি এতো ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও এতো দয়ালু, কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো খোদা নাই।"

মহানবী (সাঃ) যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, সে সময়ের একটি ঘটনা। অভিজাত কুরাইশ বংশের এক মহিলা কিছু চুরি করেছিলো। সুতরাং ইসলামী আইন অনুযায়ী তার হাত কাটা যাবে। মহিলা ছিলো একজন প্রভাবশালী কুরাইশ এবং তার আত্মীয়স্বজন তাকে রক্ষা করার জন্যে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ পেশ করে বললো যে সে অমুক ব্যক্তির কন্যা এবং তাকে শাস্তি দেয়া হলে তার সমগ্র পরিবার অপমানিত হবে। মহানবী (সাঃ) বললেনঃ

> "অসম্ভব! ইসলামী আইনের প্রয়োগ আমি বন্ধ করতে পারি না। এ মহিলা যদি অভিজাত বংশের না হতো, তোমরা তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সমর্থন করতে, কিন্তু এখন তোমরা তাকে শাস্তি না দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করছ এ কারণে যে, এতে অভিজাত পরিবার অপমানিত হবে। কিন্তু আমি তাকে কেমন করে ক্ষমা করতে পারি? কখনো না। আল্লাহ্‌র বিধান কখনো স্থগিত থাকতে পারে না, এবং কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।"

নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপোষ করেননি। কিন্তু যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত থেকেছে সেখানে তিনি খুবই কোমল এবং উদার হয়েছেন।

হযরত আলী (আঃ)ও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু ছিলেন, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কোন আপোষ করতেন না। আমাদের মাঝে যারা ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত, তাঁরা মনে করেন যে যেহেতু তাঁরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কাজেই

জনসাধারণ তাঁদের কাছে ঋণী। তাঁরা সর্বদা অন্যদের অবজ্ঞা করে চলেন এবং তাঁদের মুখে কখনো হাসি দেখা যায় না, এবং তাঁদের দেখে মনে হয় যেন ধর্ম চর্চাকারী হওয়া মানেই বিষণ্ন ও গুরুগম্ভীর হয়ে থাকা। অথচ হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত হাসি-খুশী ও প্রফুল্ল ছিলেন।

একজন মুসলমানকে কেন গুরুগম্ভীর হতে হবে? একজন ঈমানদার মুসলমান কখনো সেরূপ হতে পারে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "একজন বিশ্বাসীর মুখে থাকে হাসি আর প্রফুল্লতা এবং দুঃখ থাকে তার অন্তরে।"

হযরত আলী (রাঃ) সব সময় মানুষের সাথে হাসিমুখে দেখা করতেন। মহানবী (সাঃ)-এর মত তিনিও মানুষের সাথে শালীনতার সীমার ভিতরে মৃদু হাসি-ঠাট্টা করতেন। হযরত আলী (আঃ) এরূপ হাসি-খুশী ও প্রফুল্ল থাকতেন যে অনেকে ভবিষ্যতে তাঁর খলিফা হওয়ার পক্ষে এটাকে একটি দুর্বল দিক মনে করতেন এবং বলতেন যে, একজন খলিফাকে অবশ্যই হতে হবে গুরু-গম্ভীর যেন মানুষ তাঁকে দেখে ভয় পায়।

কিন্তু মহানবী (সাঃ) কেন সেরূপ ছিলেন না? আল্লাহ তায়ালা নবী পাক (সাঃ) সম্পর্কে বলেনঃ

> "আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি (হে মুহাম্মদ) রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।" (আল কুরআন, ৩ঃ ১৫৯)

মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বের ভূমিকা ছিলো নম্র ও দয়ালু, কঠিন ও কর্কশ নয়। হযরত আলী (আঃ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুব দয়ালু ছিলেন, কিন্তু নীতির বাস্তবায়নে ছিলে খুবই কঠোর। একবার তাঁর ভাই আকিল তাঁর কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। হযরত আলী (আঃ) তাঁর বেতন থেকে ভাই আকিলকে সাহায্য করবেন বলে জানালেন। এতে আকিল বললেন, "হে আমার ভাই, আপনার বেতনতো খুব কম। আপনি আমাকে বায়তুলমাল থেকে কিছু সাহায্য করেন না কেন?" আকিল অন্ধ ছিলেন, সুতরাং হযরত আলী (আঃ) তাঁর লোকদেরকে লোহার একটি গরম টুকরা আনতে বললেন এবং আকিলকে তা নিতে বললেন। আকিল ভাবলেন, হয়তো মুদ্রা ভর্তি একটি থলে তাঁকে দেওয়া হচ্ছে, তাই তিনি হাত দিয়ে তা ধরতে গেলে তাঁর হাত পুড়ে গেলো। তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তখন হযরত আলী (আঃ) তাঁকে বললেনঃ

"হে আকিল! বিলাপকারী নারীরা তোমার উপর বিলাপ করতে পারে। তুমি সামান্য এক টুকরা গরম লোহার স্পর্শে কাঁদছ যা মানুষে তামাশার ছলে গরম করেছে, অথচ তুমি আমাকে (বেইনসাফী ও পক্ষপাতিত্বের কারণে) সে কঠিন আগুনের দিকে পরিচালিত করছ যা মহা ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তাঁর ক্রোধের (নিদর্শন হিসেবে) তৈরী করে রেখেছেন।"

এভাবে হযরত আলী (আঃ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেমন ছিলেন কোমল ও নম্র, তেমনি খোদার আইন বাস্তবায়নে ছিলেন কঠোর।

মহানবী (সাঃ) এত দয়ালু আর নরম ছিলেন যে সকলেই তাঁকে ভালোবাসতো। এক মহিলা তাঁকে এসে বলে, "হে আল্লাহর নবী! দয়া করে আমার এ ছয় মাসের শিশুকে কোলে নিন যাতে ভবিষ্যতে সে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, তার জন্যে দোয়া করুন।" নবী পাক (সাঃ) তাই করলেন। নবী পাক (সাঃ)-এর জীবনে এ ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে এবং কখনো কখনো শিশুরা নবী পাক (সাঃ)-এর কোল ভিজিয়ে দিয়েছে। তাদের মাতাপিতারা এতে উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুত শিশুদের সরিয়ে নিত। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদেরকে বলতেন, "তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দাও।"

মন্ত্রণা সভা এবং পরামর্শ

মহানবী (সাঃ)-এর ভদ্রতার আরেকটি দিক হচ্ছে অন্যদের সাথে তাঁর পরামর্শ। তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর অন্যদের কাছ থেকে কান পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো না। তিনি এটা করতেন এ জন্যে যে যারা পরবর্তীকালে ক্ষমতার অধিকারী হবে তারা যেন নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণকে অপ্রয়োজনীয় মনে না করেন। উপরন্তু জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করার দ্বারা মহানবী (সাঃ) তাদের মনোবল বৃদ্ধি ও মর্যাদা উন্নীত করতেন। যদি কোন নেতা তাঁর লোকদের সাথে পরামর্শ না করেন, তবে তিনি যদি তাঁর সিদ্ধান্তে শতকরা একশত ভাগ সঠিক হন, তবুও তাঁর লোকেরা নিজেদেরকে ছোট ও অবনত মনে করবে এবং তারা নিজেদেরকে নেতার হাতের যন্ত্র ভাবতে থাকবে। অন্যদিকে যদি তাদের সাথে পরামর্শ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করা হয়, তবে তারা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নেতার আরো বেশী আনুগত্য করবে। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

"... এবং যখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, আল্লাহর উপর নির্ভর করো ....।"
(আল কুরআন, ৩ ঃ ১৫৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন "হে নবী! সতর্ক হোন যেন আপনার পরামর্শ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত না করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে পরামর্শ করুন কিন্তু একবার যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে যায়, তখন নেতাকে অবশ্যই তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে হবে। একবার যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে যায়, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করুন।

আল্লাহর পথে আহবান এবং আল্লাহর বাণী প্রচারের নীতি প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো। প্রচারের নীতিমালার অন্যতম হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব, নম্রতা ও দয়া এবং শক্তি, কঠোরতা ও বল প্রয়োগ এড়ানো। নেতৃত্বের বিষয়টি একটি পূর্ণ স্বাধীন বিষয় এবং তা আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত।